বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ
লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

প্রকাশ ১৩৪৭ বৈশাখ
পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৩
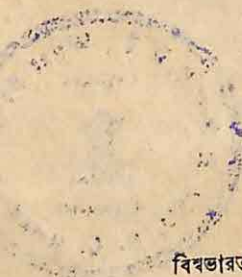
প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

ধরো ! ধরো !

ওগো ঘরে-বাইরের নাতি-নাতনীরা।

অনেক মজার জিনিস জুটিয়ে এনেছি, সব ধরো—

লক্ষ্মণ যেমন ফল ধরেছিল, ওরকম বোকার মতো নয়—

পড়বে, ভাববে, আমোদ করবে ব'লে।

তোমাদের মা-বাপেরা একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছেন,

তাই, চুপিচুপি বলি, সাবধানের মার নেই।

কানটা যদি আমার দিকে রাখ,

আমার কথা শোনার স্থবিধে তো হবেই,

ওদিক থেকে মলানির ভয়টাও কম থাকবে।

তোমাদের

দাদা
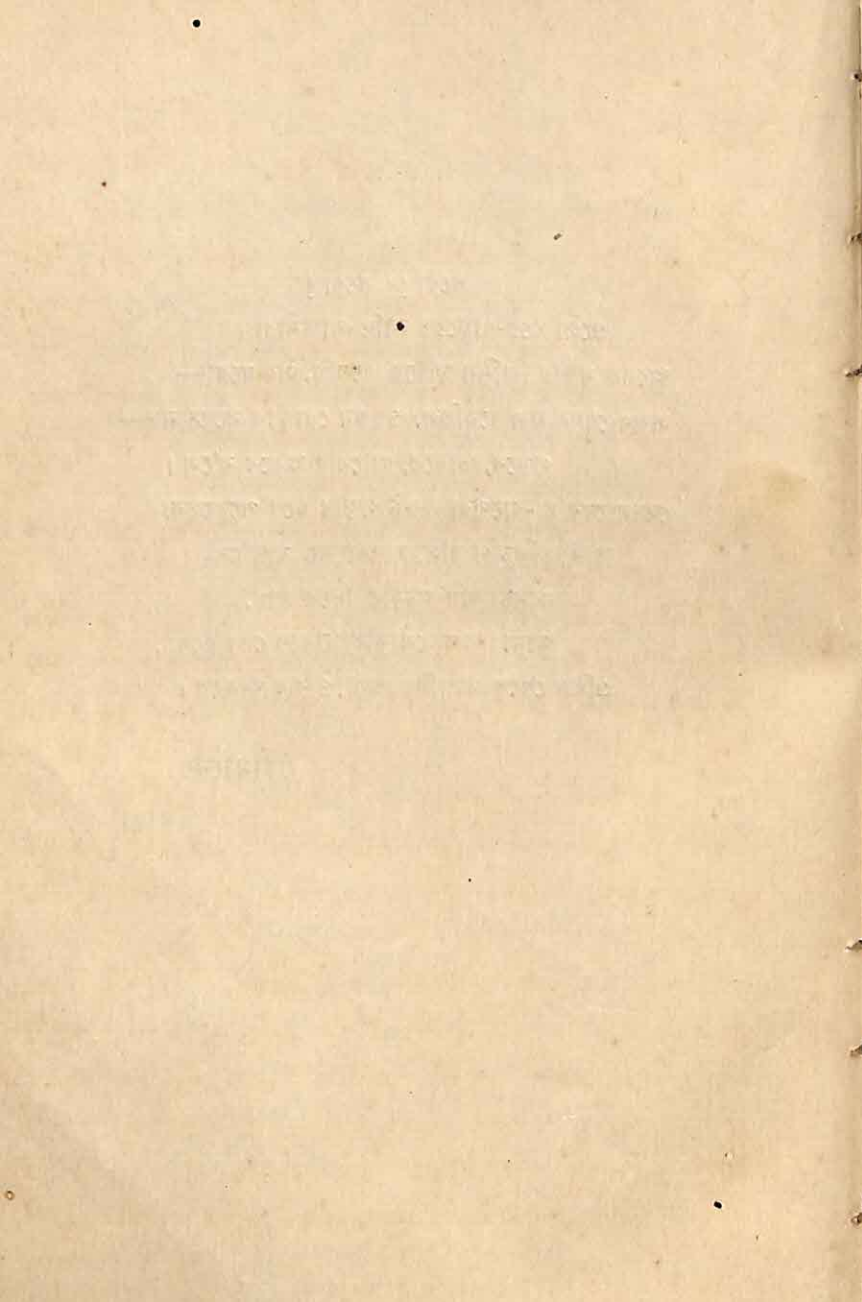
ভণিতা

ভূগোল নামে আমাদের ছেলেবেলায় যা পড়তে হত, তার বেশির ভাগই ফর্দের মতো ছিল— রাজ্যের ফর্দ, শহরের, সমুদ্রের, নদীর, পাহাড়ের, মরু-ভূমির ফর্দ। আর ছিল অঙ্কের ঘটা,— দেশের প্রসার, শহরের ভিড়, নদীর লম্বাই, পাহাড়ের খাড়াই,— রকম-বেরকমের অঙ্ক, সাংখ্য প্রদর্শনী বললেও হয়। এ সব তথ্য এমন ভাবে ধরে দেওয়া হত, যেন চিরকাল ঐ ছিল, আজও আছে, বরাবরই থাকবে। এক কথায়, জগতের জঙ্গমত্ব লোপাট করে দিয়ে পৃথিবীর চেহারা একটা স্থাবর পিণ্ডের মতো দেখানো হত।

কিন্তু আমাদের আমলটুকুর মধ্যে কী হের-ফের না দেখা গেল। কত রাজ্যের রাজা কালের কবলে পড়ল, রক্তস্রোতের তোড়ে কত সীমানার অদলবদল হল। কোথাও বা কাটা-খালের জলে মরু উদ্ধার পেল, কোথাও নদী শুখিয়ে লোকালয় উজাড় হতে চলল। সমুদ্রে সমুদ্রে যোগ করা হল, মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ বাড়তে থাকল ; যান-বাহনের গতি বেড়ে গেল তো কাছাকাছির ঘেঁষার মতি রইল না। দেখে শুনে সেয়ানা হবার পর সেকেলে ভূগোলের পাতা ওলটালে কোন্ অতীতের পুঁথির মতো লাগে।

কাজেই আজকালকার শিক্ষাব্যাপার হয়েছে রকমারি। কোন্ দেশে কত শহর আছে জানিয়ে দিলেই কথা ফুরোয় না ; সে সে জায়গায় লোকে জটলা করল কেন, নগরপল্লীর মরণবাঁচনের ধারা কেমন, তাতে দৈবের হাত কতখানি, মানুষ নিজেই বা কী করতে পারে— নানান আলোচনা এসে পড়ে। তেমনি এখানে-ওখানে পাহাড়গুলো পাশাপাশি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেখিয়ে দিলেই কৌতূহল মেটে

না ; কিসের ঠেলায় ওরা সার বেঁধে আকাশ ফুঁড়ে উঠল, ওদের গায়ে কিরকম অক্ষরে পৃথিবীর ইতিহাস টোঁকা আছে, সে লিখন কেমন ক'রে পড়ে,— শিক্ষার আসনে যিনি বসেন তাঁকে এমন কত কী খবর যোগাতে হয়।

মানুষের শিক্ষা বল, চেষ্টা বল, তার প্রথম উদ্দেশ্য লক্ষ্মীলাভ। 'প্রথম' বলছি কেন, না, সচ্ছলতার ব'নেদের উপর দাঁড়াতে না পারলে, আরো উপরের দিকে হাত বাড়ানোরই যো থাকে না। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, তাঁকে পাবার লালসে লোকে যে-রকম ঠেলাঠেলি কাড়া-কাড়ি বাধায়, তাতে লক্ষ্মীকে দেশছাড়া কেন, পৃথিবীছাড়া করার যোগাড় করেছে। দোষ শুধু এ যুগের নয়, মন দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, কোনো দেশে কোনো কালে লক্ষ্মীকে সুস্থির হয়ে তিষ্ঠতে দেওয়া হয়নি। সাধে চাঞ্চল্যরোগ তাঁর ধাতে ব'সে গেছে।

ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের সত্যযুগে তাঁদের সাধনায় পাওয়া অধ্যাত্মতত্ত্ব আজও জগতের সম্পদ ব'লে মানা হয়। কিন্তু লক্ষ্মীকে আটক রাখার কথা তাঁরা ভাবেননি, তাই তাঁদের প্রচার-করা বাণী চিদাকাশেই উড়ে বেড়াচ্ছে, কর্মদেহ নিয়ে ধরাধামের লক্ষ্মীশ্রী বিধান করে উঠতে পারল না।

ত্রেতার ক্ষত্রিয়রাজারা একমাত্র ভারতে প্রকট হননি. পৃথিবীময় বিকটভাবে তাঁরা দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। "পুরুষসিংহ" উপাধি পাবার যোগ্যপাত্র হলেও, সাম্রাজ্যনেশায় তাঁদের উদ্যোগ বরাবর এমনি উদ্ভ্রান্ত যে, হতভাগা প্রজাদের শ্রীসমৃদ্ধি বারে বারে নষ্ট বৈ পুষ্ট হতেই পেল না।

এক রকমের বাহাদুরি দেখিয়েছেন দ্বাপরের বৈশ্য কর্তারা, য়ুরোপে যাঁরা বিরাজ করেন। ওঁদের লোভ তো রাবণের চুলোর মতো জ্বলতেই

আছে। সে-লোভের খোরাক জোগাবার কাজে ওঁরা ব্রাহ্মণের বিজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব, দুটোকেই জুড়ি জুতে লাগিয়ে রাখতে পেরেছেন। মাঝে মাঝে যুদ্ধের যে-আগুন জ্বলে ওঠে তার ঝলসানি খেয়েও ওঁদের হুঁশ হল না, আসছে বারের অগ্নিকাণ্ডে পিলপিল করে ঝাঁপ দেওয়াটা বাকি। ইতিমধ্যে গো-বেচারীর আড্ডা যেখানে যত ছিল, তা লুটপাট করে এক একটি কুবের হয়ে উঠলেও, লক্ষ্মীলাভের হিসেবে ওঁদের নাম খরচের খাতায় লিখতে হয়।

রইল শূদ্র, যাঁদিকে ভাষায় বলে শ্রমিক। ঘোর কলি ঘনিয়ে আসায় এবার লক্ষ্মী-আহ্বানের পালা পড়েছে তাঁদের। গত ক'বার অবতার হয়েছেন এক-একটি করে জীব, নৃসিংহের বেলা না হয় জোড়া জীব। গতিক যেরকম, এবার বুঝি মানবসংঘের বৃহৎ কলেবরে ভগবান অবতীর্ণ হতে ইচ্ছে করছেন। এবার শ্রমিকের রাজত্বের পালা। ধনীর দিন ফুরিয়ে আসার আভাস চারিদিকেই পাওয়া যাচ্ছে। রুশদেশে শ্রমিক-প্রধান তন্ত্র দেখতে দেখতে গড়ে উঠছে। হয়তো সেখানে স্বয়ং কল্‌কি এসে পড়েছেন বা,—সেই USSR[১] এর মূর্তি ধরে, যাঁদের সংঘবদ্ধ উদ্যমে পুরোনো মানবসমাজের যত আধ-মরা সংস্কার-বিকার আচারবিচার, সমস্ত ঝেঁটিয়ে ফেলে আগামী সত্যযুগের জমি পরিষ্কার করে রাখা হচ্ছে।

সে যাই হোক, এইটুকু ঠিক যে, লক্ষ্মীকে অচলা করে রাখতে না পারলেও, USSR তাঁর প্রসাদ বিতরণের এলোমেলো-পনা কাটিয়ে ওঠার হিকমত বার করেছেন। ধাত যাবে কোথায়, এঁদেরও এলাকার মধ্যে

---

১ ইউ এস্ এস্ আর রুশ-মহাদেশের সমবেত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ।

লক্ষ্মী অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ান, কখনো দিতে ভোলেন, কখনো বা বেশি ঢালেন ; কিন্তু এঁদের পঞ্চবার্ষিক সংকল্প (5-year-plan) যখন যেখানে যতখানি পায়, কুড়িয়ে গুছিয়ে নিয়ে তা থেকে সবাইকার দরকার বুঝে পরিবেশন করে। তা ছাড়া, ভক্তের আওড়ানো মন্ত্র অনেক সময় দেবী কানেই তোলেন না, কিন্তু এঁদের নাছোড়বান্দা বৈজ্ঞানিক তন্ত্রের পেড়াপিড়ি তিনি অত সহজে এড়াতে পারেন না।

সেকালের কথকঠাকুরেরা যে সব পুরাণকাহিনী বলতেন, তার চেয়ে লক্ষ্মীছাড়া নারায়ণের চির বিরহ ঘোচাবার জন্যে USSR-এর যে নতুন ধরনের যজ্ঞ চলছে, তার গল্প কম মনোহারী বা হিতকারী হবে না, এই আশায় নারায়ণ (বলতে বিশ্বমানবের যিনি অন্তর্যামী নিয়ন্তা) নরোত্তম (বলতে যাঁরা গুরুস্থানীয়) আর দেবী সরস্বতী (বলতে যে প্রজ্ঞার কৃপায় গুরুবাণীর মর্ম হৃদয়ংগম হয়) মনে মনে তাঁদিকে নমস্কার ক'রে আমি ভনতে বসে গেছি। পুণ্যবান না হলেও কারো শুনতে মানা নেই। ইতি

সুরেন ঠাকুর

নির্ঘণ্ট

পঞ্চম পালা : চতুর্বর্গের ফল বিচার

পালান্ত পরিচ্ছেদ

টিপ্পনী

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ

প্রথম পালা

দরিদ্রনারায়ণের মোহভঙ্গ

বেদের গল্প

য়ুরোপে-এসিয়ায় পৃথিবীর ষষ্ঠাংশ-জোড়া প্রকাণ্ড রুশমহাদেশে যুগান্তর হওয়ার আগে, তার প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ ছিল মরু, তাও বাড়তেই চলেছিল। মরু বলতে জনশূন্য জলহীন বালি ধূ ধূ করার ছবি মনে আসে। আসলে, কিন্তু, দৃশ্যটা তত ফাঁকা নয়। USSRএর কথা যখন হচ্ছে, তখন রুশের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা-চওড়া "কারা-কুম" (কালো বালি) মরুর কথাটাই ধরা যাক।

উপরে তো বালি, কিন্তু কিছু দূর খুঁড়লে তলার ভিজে মাটি বেরিয়ে পড়ে। ও দেশের বর্ষা হয় বসন্তকালে, সে সময় বালির উপর এখানে-ওখানে কাঁটা-ঘাস, ডাঁটা-সার-সরু পাতার গাছ, এ রকম কিছু কিছু উদ্ভিদ গজায়। চেপটা-গড়নের ঝাঁকড়া পাতার বাহার দিতে গেলে গাছের ঘড়া ঘড়া জল খাওয়া লাগে, এমন জায়গায় তা তো জোটে না। ঢেউ-খেলানো বালির খোঁদলে বর্ষার জল জমে, তাতে দেখা দেয় পাঁকের মাছ ; আর উপরে কিলবিল করে বেলে সাপ। মাছগুলো কাদার মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়ে সোজাসুজি হাওয়ার নিশ্বেস টানতে শিখেছে, আর সাপগুলো বালিতে সাঁতরে বেড়ানো অভ্যেস করেছে। মরুজীবিকে মরুভূমির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। যেমন উট, কাঁটা খেয়ে জল না খেয়ে চালিয়ে দেয় ; বেলে রঙের সিংহকে তার খাদ্যসম্বন্ধীদের ঠাওর হয় না, নইলে তারা পালিয়ে বাঁচত, সিংহ অনাহারে মরত।

মানুষের মধ্যে, ঘুরঘুরে তুর্কীবেদের দল বসন্ত-বর্ষার মর্স্থমে এই

কারাকুমে তাদের ঘোড়া ভেড়া চরাতে এসে স্ত্রী-ছেলেপিলে নিয়ে ছাপ্পর বেঁধে থাকে ; এক অঞ্চলের ঘাস-গাছড়া ফুরিয়ে গেলে হঠে বসে ; শেষে গর্মি পড়ায় সবুজের পালা সাঙ্গ হলে, লটবহর গুটিয়ে দক্ষিণের পাহাড় পানে ধাওয়া করে।

সম্রাটের আমলে এই কারাকুমের ভিতর দিয়ে প্রথমে জল যাবার নহর, তার পর এক রেল লাইন চালিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারখানা কী। হঠাৎ বুঝি রাজার বা উজিরের মরুবাসীর পিপাসার কথা মনে পড়ায়, প্রজাবাৎসল্য উথলে উঠল?— তা নয়। মরুর ওপারে মধ্য-এসিয়ার বড়ো বড়ো নদীর ধারে যেসব জাঁকালো শহর, ফলন্ত খেতবাগান আছে, সেখানকার ভালো ভালো জিনিস আমদানির সহজ উপায় চাই, তারি এই আয়োজন।

জল না হলে ইঞ্জিন চলে না ; রেলগাড়ি না দৌড়লে লম্বা পথ ফুরোয় না,—আগেকার দিনে বোগ্‌দাদের খলিফাকে রুশের সেরা খরমুজ সরবরাহ করতে হলে এক একটি ফল বরফভরা সীসেমোড়া আলাদা বাক্সবন্দী করে উটের পিঠে মরু পার করতে তিন তিন মাস লেগে যেত।

আর একটু কথাও আছে। রেলপথে যখনতখন ইচ্ছেমতো গাড়ি গাড়ি পল্টন পাঠাতে পারলে দেশটাকে বেশ সহজে শাসনে রাখা যায়।

যা হোক রেলগাড়ি চলল, মরুদেশ সম্রাটের তাঁবে এল,—তাহলে বেদেরা অন্তত তাঁর প্রজা হওয়ার গৌরবটা তো পেল?—মোটেই তা নয়। এমন হতভাগা প্রজার উপর রাজাগিরি ফলাবার শখ মহামহিম রুশসম্রাটের ছিলই না, উলটে তাদের জ্বালায় রাজ-আমলারা অস্থির। জলের নহর পেয়ে দু'ধারে তারা ভিটে তুলে বসবাস ফাঁদে আর কি।

সম্রাটের মোসাহেবের দল তাক করে বসে ছিল, রেলধারে খালধারে জমিদারি পত্তন করবে, প্রজা দিয়ে ফসল ফলাবে, কারখানা চালাবে, তাদিকে দুটি দুটি খেতে দেবে, মোটা টাকা পৌঁছবে জমিদারের খাজানায়। কিন্তু বেদেরা কায়েম হয়ে জুড়ে বসলে সব মাটি। তখন তাদিকে উচ্ছেদ করার ঝামেলা পোয়াবে কে।

হুকুম জারি হল—"নিকালো!"

আমলায় ধরে আনতে বললে, পেয়াদায় বেঁধে আনে,—রাজকায়দার এ ধারা তো জাহির আছেই। সদর সেনাপতি সেদিকের সেনানায়ককে পত্র দিলেন—"য়োমুদে (তুর্কি বেদে)রা খালধারে যেখানে যেখানে আড্ডা করেছে, পলটন চড়াও করে তাদিকে সরিয়ে দেবেন।"

কশাক-পলটনের সরদারকে ডাকিয়ে সেনানায়ক বললেন, "সওয়ার নিয়ে রাজার হুকুম তামিল করে এসো, দেখো যেন একটাও বাকি না থাকে।"

এক সার কশাক-সওয়ারের ভীষণ চেহারা দূর থেকে দেখেই তো বেদেদের আক্কেল গুড়ুম। যে পারলে সে ঘরবাড়ি পরিবার জিনিসপত্র ফেলে, ঘোড়ায় চেপে মার টেনে দৌড়। কিন্তু তাতে কি রেহাই পায় —অক্ষরে অক্ষরে হুকুম মানতে না পারলে সেপাইয়ের ইজ্জত থাকে কই। তার উপর ষণ্ডা গুণ্ডা হলে যা হয়, হঠাৎ খুন-চাপা রোগে ধরে। কাজেই তেজী ঘোড়া ছুটিয়ে একদল সওয়ার পলাতক বেদেদের টাট্টু-গুলোকে তেড়ে ধরল আর পাশাপাশি দৌড়তে দৌড়তেই চমৎকার হাত-সাফাই দেখিয়ে তলোয়ারের এক এক কোপে এক এক বেদের মাথা ওড়াল। ওদিকে, ছাপ্পরের আশেপাশে যেসব ছেলে-বুড়ো-স্ত্রীলোক পড়ে ছিল, আর এক দল গিয়ে তাদিকে সাবাড় করল।

কথাটা বিশ্বাস করা একটু শক্ত—না?

কিন্তু বিখ্যাত রুশীয় লেখক (এম্ ইলিন্)[১] সম্রাটের মোহর-বসানো হুকুমনামার নম্বর তারিখ ধরে দিয়েছেন – নং ১১৬৭, ৬ই জুন, ১৮৭৩। তা ছাড়া, ভেবে দেখতে গেলে, নিরীহের উপর চোটপাট করে বাহাদুরি নিতে কোন্ পেশাদার বীর কবে কোথায় নারাজ হয়েছে।

চাষার গল্প

ফসলখেতে ফলবাগানে রেলগাড়ি করে জল যোগাতে হলে জমির বিঘে পিছু আস্ত এক ট্রেন জলের টাঁকি দরকার হত,— ভাগ্যিস্ তা করতে হয় না। তবে রেলেরই মতো বাঁধা পথে জল আসাযাওয়ার চক্কর খায়। আসার লাইন আকাশের ভিতর দিয়ে—সাগর থেকে ডাঙা; ফেরত লাইন মাটির উপর দিয়ে—ডাঙা থেকে সাগর। ফিরতি পথে, নদী বেয়ে যাবার সময়, জলে বিস্তর মাল বোঝাই থাকে,—এঁটেলমাটি, রকম বেরকমের নুন, কিছু কিছু ধাতু, প্রাণীর দেহপুষ্টির কাজে লাগে এমন অনেক জিনিস; শেষে এগুলোকে সমুদ্রে ঢেলে দিয়ে, মেঘ হয়ে, জল আকাশ-পথে হালকা চলে আসে। ঐ মাল যদি সব-কে-সব সমুদ্রে ফেলা যেত, তাহলে ডাঙার জমি ক্রমশ অসার হয়ে, প্রাণী বাঁচিয়ে রাখার অযোগ্য হয়ে পড়ত। কিন্তু গাছের কল্যাণে ধরিত্রীর সে দশা ঘটতে পায় না।

গাছ করে কী, জল সমুদ্রে যাবার সময় তাকে নিজের মধ্যে একক্ষেপ ঘুরিয়ে এনে দেশের মাটির তেজ বজায় রাখে। এই যে ব্রাঞ্চ লাইন, মাটি—গাছ, গাছ—মাটি, এর ভিতর দিয়ে জল চলার সময় গাছ নানা রকম ক্রিয়া করতে থাকে।

---

১ প্রথম দুই পালায় বলা অনেক বৃত্তান্ত এই লেখকের (মেন্ এ্যাণ্ড মাউনটেনস্) বই থেকে নেওয়া।

এক তো, মালে-বোঝাই জল থেকে নিজের শিকড় গুঁড়ি ডালপালা ফুল বীজ তৈরি করতে যা যা লাগে তা টেনে নেয় ; পরে নিজের মূল ডাঁটা-পাতা-ফল অন্য প্রাণীর সেবায় লাগায় ; শেষে, বড়ো গাছ পাতা ঝরিয়ে, ছোটো গাছ আস্ত মরা-দেহ দিয়ে, মাটির জিনিস মাটিকে ফিরিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে, পাতার প্রশ্বাসের ভাপ হাওয়াটাকে ভিজিয়ে ঠাণ্ডা রাখে, নইলে রোদে-তাতা মরু-বালির উপরকার বাতাস ঝাঁজিয়ে গিয়ে যেমন হয়, তাই হত,—আকাশে মেঘ জমতেই দিত না, এলেও বর্ষাত না, যদি বা অল্পসল্প জল ঝরত তা মাঝপথেই শুখনো হাওয়ায় খেয়ে নিত, জমিতে পৌঁছত না।

গাছের আর এক ক্রিয়া এই— বৃষ্টির মুষলধার অবাধে মাটির উপর পড়লে তাতে গর্ত হয়ে যায়, পড়া-জল তোড়ে গড়াতে থাকলে উপরকার সারালো মাটি কেটে নিয়ে চলে, কাটা খোয়াইয়ের ভিতর দিয়ে সব জলটা হুড়মুড় ক'রে নদীতে নেমে পড়ে, কারো কোনো কাজে লাগার জন্যে দুদণ্ড কোথাও তিষ্ঠয় না। গাছ থাকলে আকাশের জলকে এ রকম ছ্যাবলামি করতে দেয় না—বৃষ্টির চোট নিজের মাথায় নিয়ে জলটাকে কতক পাতার ডগা দিয়ে, কতক গুঁড়ির গা বেয়ে, আস্তে আস্তে নামিয়ে ফেলে, তাকে ঝরা পাতার লেপ চাপা দিয়ে, রোদে শুখিয়ে যেতে দেয় না, তাড়াতাড়ি গড়াতে দেয় না, তলে তলে গম্ভীর চালে নদীতে পৌঁছে দেয়।

তাই বড়ো গাছের বন থাকলে দেশে অনাবৃষ্টি হতে পায় না, ভালো জমি খয়ে মরুভূমি হয়ে দাঁড়ায় না।

রুশে ভারি ভারি জঙ্গল ছিল, যাতে প্রজারা কাঠ-কাঠরার কুঁড়ে বেঁধে থাকত ; কুড়োনো কুটোকাটার জ্বালে রান্না করত, শীত কাটাত, বনের ফাঁকে ফাঁকে জানোয়ার চরাত, কিছু ফসলও লাগাত। সেই জঙ্গলের উপর লোভ লাগল উপর-ওয়ালাদের।

রব উঠল—"বেটাদের যেমন বুদ্ধি ভোঁতা, তেমনি নজর ছোটো, খালি নিজেদের খুচরো এটা ওটা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, দেশহিতৈষণা কাকে বলে তা জানেও না ; দেশের এত বড়ো লাভের সম্পত্তি জংলী প্রজারা কি না বেকায়দা আটকে রাখতে চায়।"

ফলে প্রজাদের স্বত্ব ছুটে গেল, জঙ্গল সব বেঁটে দেওয়া হল জমিদারদের মধ্যে। সে বেচারীদের তো সদাই খাঁকৃতি, বাড়িটা গাড়িটা আসবাবটা-আসটা পুরোপুরি না রাখলে মানই থাকে না, আরামটুকু তো পরের কথা। তাই, যেমন-তেমন করে জঙ্গল কাটলে আখেরে লোকসান, সে কথা জানা থাকলেও মস্ত মস্ত পুরোনো গাছের দাম, আবাদী জমির উপস্বত্ব, এ সব নগদ আদায় হাত পা গুটিয়ে ব'সে খোয়ানো কি তাদের প্রাণে সয়। পরের ভাবনা পরে যারা আসবে তারা ভাববে।

জঙ্গল কাটতে কাটতে গাদা-করা কাঠের দাম প'ড়ে গেল, আবাদ বাড়াতে বাড়াতে জলের দরে রাশ রাশ ফসল বাজারে ছাড়তে হল, তখন প্রভুরা ক্ষান্ত হলেন। কিন্তু তার মধ্যেই দেশের দফা হল নিকেশ, পড়ে গেল অনাবৃষ্টির পালা। প্রথমটা চার পাঁচ বছর অন্তর, শেষে তিন বছর দু'বছর অন্তর, দুর্বৎসর ঘনিয়ে আসতে লাগল।

ফসল অজন্মা বলে রাজা তো প্রজাকে ছাড়ে না—"চুক্তি অমান্য করা, তা কি হয়!"

ওদিকে স্বাধীনভাবে চাষের অধিকার পেতে যে-সেলামী লাগে তাই কুলোয় না, প্রজায় খাজনা দেবে কোত্থেকে, খাবেই বা কী। শেষে স্ত্রী ছেলেপিলে আত্মীয়বাড়ি রেখে, তারা দলে দলে মজুরি খাটতে বেরল।

অনেকে গেল শহরে। সেখানে দশ-জন-থাকা ঘরে বিশ-ত্রিশ-জন ঠাসাঠাসি ক'রে থেকে রোগ বাধাল, রোগ ছড়াতে লাগল, কর্তারা

আতঙ্কে সারা। যারা টিকে রইল তারা শেষে পুলিসের গুঁতোর চোটে ফের বাড়িমুখো হল।

আর অনেকে গেল, পথে ভিক্ষে করতে করতে, প্রদেশের পর প্রদেশ ছাড়িয়ে, সেই সাইবীরিয়ায়। বাড়িতে থাকলে তো ঠায় মরণ, যে দেশে খাটবার লোকের অভাব, সেখানে যদি খোরাক জোটে। কারো কারো কাজ জুটল বটে, যাদের কপালে তা না হল তারা ফিরতি বেলা রাস্তার ধারে হাড় ক'খানি রাখল; দু'দুবার রক্ত-মাংসের শরীরে ঐ অফুরন্ত পথ কি খালি-পেটে পার হওয়া যায়।

গবর্নমেণ্টের রিপোর্টে আক্ষেপ প্রকাশ হল, "প্রজাদের এ কী দেশ-ছাড়া পাগলামিতে পেয়েছে। জমিদারদের যে সর্বনাশ, ঠিকে লোক দিয়ে চাষ করাতে হলে খরচ বেড়ে যাবে কত।" ভেবেচিন্তে সাব্যস্ত হল, "গ্রামে গ্রামে অক্ষমদের জন্যে দাও কিছু দানা পাঠিয়ে।"

উকিলে আমলায় তা থেকে নিজের নিজের তোলা নেবার পর, রাজ্যের আবর্জনা দিয়ে ওজনে পুরিয়ে যা পৌঁছে দিলে সেটা এত রকমের মিশল যে, দানা ছাড়া কোনো নামের মধ্যে তাকে আনা যায় না; আর পরিমাণে এত কম যে তাতে জন-পিছু দিনে এক ছটাকও হয় না।

সক্ষমদের পক্ষে হুকুম হল আলাদা, "ভিক্ষে বৃত্তির প্রশ্রয় দিলে চরিত্র নষ্ট হবে। তৈরি করো কতকগুলো রেলের রাস্তা, তাদের সকলকে কাজে লাগিয়ে দাও।"

কিন্তু কুলির সর্দার অভিযোগ জানাল, "হুজুর, এ সব নিখাকী মজুর নিয়ে করব কী। পায়ে বল নেই, টলতে টলতে আসে; হাতে জোর নেই, কোদাল ওঠেই না।"

উত্তর এল, "বটে, কাজে ফাঁকি দেবার ফন্দি। বদমাশগুলোকে

চাবকে লাল ক'রে ধ'রে বেঁধে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।" আর আইন জারি হল, "ভিটে ছেড়ে প্রজার যাওয়াই নিষেধ।"

প্রজার সে ভিটেকে ভদ্রাসন বললে ঠাট্টা করা হয়। জঙ্গলের কাঠ কাটা দূরে থাক্‌, প্রজার কাঠকুড়োনো পর্যন্ত বারণ,— কুড়ুলের আওয়াজ কোথাও শোনা যাচ্ছে কি না, সেদিকে কান পেতে জমিদারের সওয়ার সারাদিন ঘুরছে। অগত্যা, ডাঁটা-লতা-পাতা জড়িয়ে কোনো রকমে দেওয়াল-খাড়া-করা খড়ের ছাউনি-দেওয়া তাদের ঘর। তবু মানুষ-থাকার ঘরগুলো ওরি মধ্যে একটু মজবুত, জানোয়ারদের ঘরের পল্‌কা দেওয়ালে বাইরের জলবাতাস একেবারেই রোখে না, আর গোরুর খাবারের অনাটন হলে চালের খড় প্রায়ই নেমে আসে। এ অবস্থায় দারুণ শীতের সময় যত গোরু-শুয়োর সব মানুষ-থাকা ঘরে না ঢোকালে তারা বাঁচে না। এতে স্বস্তি-স্বাস্থ্যের যা হাল হয় তা কি বর্ণনার অপেক্ষা রাখে।

আর প্রজাদের খাবার? দুর্বৎসরে যে দানাটুকু জোটে তা ভেঙে রুটি হওয়ার কাছ দিয়েও যায় না, কাজেই ছাই-পাঁশ মেশানো সে দানার সঙ্গে জংলী ঘাস-পাতা থেঁৎলে পেট-ভরানো চেহারার রুটির মতো একটা কিছু দাঁড় করাতে হয়,— যা শুঁখলে কুকুর বেড়াল মুখ ফেরায়, মুরগিকে খাওয়ালে মারাই পড়ে,— প্রজারা পেটের জ্বালায় বমি চেপে তাই গেলে। তার উপর কাঁচা জ্বালানির চিড়বিড়ে ধোঁয়ার তাড়সে ওদের চোখের মাথা খাওয়া যায়, বয়স না যেতেই প্রায় অন্ধ।

গাঁয়ে থাকলে না খেয়ে মরা, গ্রাম ছাড়লে মার খেয়ে মরা, এই এমনেও গেছি অমনেও গেছি অবস্থায় ওরা মরিয়া হয়ে চুরিডাকাতি,

জমিদারবাড়ি-জ্বালানো আরম্ভ করলে। তখন সদর থেকে পলটন এসে গুলি চালিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দিলে।

শহরে কি অবস্থাপন্ন দয়ালু লোক কেউ ছিল না?—ছিল বৈ কি। দুর্ভিক্ষে কি সকলের লোকসান। ভেজাল-দেওয়া জিনিস চড়া-দামে বেচে কারো বড়ো বাড়ি হয়, কারো নগদ টাকা জমে। তখন দয়া করারও ফুরসত আসে। থিয়েটার-রে, কনসার্ট-রে, কতরকমের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করে গ্রামবাসীদের জন্যে টাকা তোলা হল; উচ্ছিষ্ট দিয়ে সুরুয়া তৈরি করে শহরের পাড়ায় পাড়ায় কাঙালী বিদায়ের ধুম লেগে গেল। কিন্তু তাও বলতে হয়, হাজার বদান্য হলেও লোকে কি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধৈর্য রাখতে পেরে ওঠে? খেতে পাই না, খেতে পাই না, ঐ একঘেয়ে চীৎকার শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা, মনে ঘাটা পড়ে যায়।

তবুও সেই খাই খাই, রোজই খাই খাই, অবুঝ প্রজাগুলো সামান্য খাওয়াটা বাঁচাটার জন্যে কি খ্যাপানটাই খেপেছিল।

দুর্গতিনাশন যজ্ঞারম্ভ

মনে হতে পারে বোবা সাক্ষীর জবানবন্দি হয়ই না। কিন্তু রুশের প্রজাকে পেয়াদায় নীরবে যা সওয়াল, তার বিবরণ নারায়ণের নথির মধ্যে ঠিক উঠে গেল। তবে কি না, তিনি শেষ নাগের নরম পিঠের উপর দিব্যি হেলান দিয়ে বোধ করি একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলেন, তাই সে সব কথা বিচার আমলে আসতে কত দিন যে লেগে গেল তার ঠিকানা নেই। কি নরের, কিবা নারায়ণের, আদালত দেখি সব এক ছাঁচে ঢালা, তাদের গড়িমসি চালের আর শেষ পাওয়া যায় না।

পরে অবশ্য বোঝা গেল, কোনো অবসরে রায়টা চুপি চুপি দিয়ে রাখা হয়েছিল।

লাখ কথা লাগেনি, এক কথার সে রায়—"বিপ্লব!"

তাও কিন্তু অনেক-কাল নথির মধ্যেই চাপা পড়ে রইল। অবশেষে ডিক্রি জারি হল ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে।

জারির দিনটা কি বিশ্বমানবের একটা পরবের মধ্যে দাঁড়াবে।

দেখা যাক। জানা যাবে USSR-এর যজ্ঞ আর একটু এগোলে।

ডিগ্রির মোট কথা এই—এ রাজা, সে উজীরের দোষ নয়, কুব্যবস্থার দোষেই মানুষ দুরবস্থায় পড়ে। যে জিনিস সকলের, তাকে "আমার" "আমার" বলে টানাটানি, বিনা শ্রমে পরের শ্রমের ফলভোগের চেষ্টা, এতেই পাপ; পাপ করা, পাপের প্রতীকার না করা, দুয়েরই পরিণাম মৃত্যু। বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে মানুষের দেবার ক্ষমতা কম-বেশি; কিন্তু শরীর মনকে সুস্থ রাখবার জন্যে খাওয়াপরার দরকার সকলের পক্ষে সমান। অতএব যার যতদূর ক্ষমতা সকলে উৎপাদন করুক, উৎপন্ন ফল সবাইকে যথাযথ ভাগ করে দেওয়া হোক। এই নিয়ম পালন করলে-পর সমবেত চেষ্টার ফলন কারো পক্ষে অকুলন হবে না। শ্রমিক প্রজা, শ্রমিক রাজা, শ্রমিক ছাড়া আর পক্ষই নেই, এ রকমটা হলে রাজা-প্রজার, ধনী-দরিদ্রের, বিবাদ ভঞ্জন হবে, সুনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটার যা মূল কারণ সেই লোভের লোপ হবে। দৈবের উপর নির্ভর করা ছেড়ে দিয়ে নরনারী দেবতাকে নিজের বশে আনতে পারলে তারা নরোত্তম পদ লাভ করবে, তখন অভাব বা অসাধ্য কিছু থাকবে না।

এ রায়ের জোরে আশা হয়, লম্বা লম্বা তিন যুগের ভোগ ভুগে, মানুষের ধর্মবুদ্ধির জড়তা এবার হয়তো কাটবে। আর কিছু না হোক,

গল্‌তিটা কিসে কিসে হয়েছিল, সেটুকু কলির শেষে USSR-এর কাছে ধরা পড়েছে বলে মনে হয়।

প্রকাশ হয়েছে যে, নারায়ণীকে দ্বৈতরূপে দেখাটাই যত নষ্টের গোড়া। সরস্বতীর তো ভুবনভোলানো রূপ, চকিতেমাত্র তাঁর যে দেখা পায় সে থ হয়ে যায়, লক্ষ্মীর দিকে আর চায় না। আবার লক্ষ্মীকে অবহেলা করলে সরস্বতী অন্তর্ধান হন, অন্তত বাম হয়ে থাকেন। এই উভয় সংকটের মধ্যে মানুষ এত দিন হাবুডুবু খাচ্ছিল।

USSR বুঝতে পারলেন, নারায়ণীকে একেশ্বরী জেনে সংবর্ধনা না করলে তিনি নারায়ণকে ধরা দেবেন না। আমরাও আল্মা[১]-মায়ের দৌলতে সরস্বতীকে একটু আধটু চিনে নিয়েছি। শুধু "ফুল নে মা" ব'লে আদর কাড়তে গেলে তিনি গলেন না; গাধা-খাটুনি খেটে হদ্দ হলেও তিনি টলেন না; রসে কষে ঠিকমতো মিলিয়ে নিবেদন না করলে তিনি দক্ষিণ-মুখ ফেরান না, যাকে বলে "প্রসাদ" তা মেলে না। তাই USSR সরস্বতীর দুই বর পুত্র কবি-মনীষীর আশ্রয় নিয়ে তাঁর খাতির রাখলেন, আর উভয়কে কর্মী বানিয়ে লাগিয়ে দিলেন লক্ষ্মীর আরাধনায়। বুদ্ধিটা খেলিয়েছেন ভালো. স্বীকার করতে হয়।

পুরাকালে আরাধনা বলতে ঠিক-কে-ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ করা, মান্ধাতার আমলের যত কিছু তুক-তাক কোনোটি বাদ না পড়া, এই বোঝাত; মাঝে বোঝাতে লাগল ভক্তি-বিলাসের ঘটা— স্তব গান, বাতি ফুল-চন্দনের বাহার; হালে বোঝায় ভালো মনে সমানে খেটে চলা, পদে পদে দুর্গতির নিদান-জিজ্ঞাসা, দফে দফে জানা বা খুঁজে পাওয়া ওষুধ প্রয়োগ, এই উপায়ে সাধারণের সেবায় প্রত্যেকের সাগ্রহ

১ Alma-mater ইলম্‌ দাতা মাতা।

সাধনা,—যার মধ্যে কোনো দেবতার নাম বা চিন্তা না করলেও, বিনা-নিমন্ত্রণে সব দেবতারা এসে রমণ করেন।

এইভাবে USSR মহা-সমীকরণ যজ্ঞ ফেঁদেছেন। তাই দেখে পৃথিবীর যত রাজা-রাজড়ার মেজাজ যে রকম খিঁচ্ড়েছে, এর নাম "রাজসূয় যজ্ঞ" দিলেও চলে। আকাশ বাতাস মাটি জল রোদ বৃষ্টিকে নানা প্রাণীকে, তার উপর নিজের মনকেও, মানুষের মতো মানুষের জীবনধারণের উপযোগী করে আনা, এই হল এ যজ্ঞের এক এক অঙ্গ। অঙ্গগুলি ক্রমশ ভালোয় ভালোয় উতরে গিয়ে যজ্ঞ পূর্ণ হলে তখন পৃথিবীমাতার বিশ্ব-মানব-ধারিণী নাম সাজবে।

যজ্ঞ ব্যাপার চলছে কেমন, তা বিচার করতে হলে কোন্ কোন্ কথা বুঝতে হবে, মনে রাখতে হবে, সে সব কথা পালায় পালায় ক্রমশ বলা যাবে।

দ্বিতীয় পালা

পঞ্চভূতের বশীকরণ

মাটির কথা

সূর্যের প্রতাপে পরাস্ত ম্রিয়মাণ মরু-বেচারা ধুলোয় গড়াগড়ি যায়,—এ বর্ণনাটা ভুল। মরুটা রাক্ষস, লকলকে জিভ বাড়িয়ে ভালোজমি চেটে খেয়ে নিজের সামিল করতে চায়। বাতাসের সাহায্যে বালির আক্রমণের নমুনা এ দেশেও দেখা যায়। সমুদ্রতীরের বাড়িতে পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে বাইরের বালি হাতার মধ্যে ঢিবি হয়ে ওঠে। বালির উপর দিয়ে রাস্তা পাকা ক'রে বাঁধলেও তার চিহ্ন বজায় রাখা দায়। কণারকের মস্ত বড়ো সূর্য-মন্দিরটাই বালি চাপা পড়েছিল। কাঠিয়াওয়াড় থেকে বালি উড়ে এসে রাজপুতানাকে মরুময় করে তুলেছে। বালি-চলা রুখতে না পারলে, বাতাস যেদিকে বয়, সেদিকে মরু এগোয়।

শুধু ভূমি নিয়ে মরু নয়, মরুর মধ্যে উপরের হাওয়াটাকেও ধরতে হয়—হাওয়াই বা বলছি কাকে, সে-যে অদৃশ্য আগুন। মরু-বালি যদি চলে বিশ পঞ্চাশ মাইল তো মরু-বাতাসের দৌড় হাজার মাইল। যখন ভরা গর্মিতে, সূর্যের-মারা অগ্নিবাণ ঠিক্‌রে, বালিটা ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন উপরকার হাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাক খেয়ে যুদ্ধযাত্রায় বেরোয়—একা চললে 'লূ' বালি-কণা উড়িয়ে নিলে 'আঁধি'। মধ্য-এসিয়ার লূ লেগে রুশের অপর পারের উক্রেন প্রদেশে খেতের শস্য শুখোয়। দক্ষিণ থেকে আঁধি এলে রুশ চাষারা বলাবলি করে, "ইরানীরা কাপড় ঝাড়ছে।" এই আঁধি রুশের ফলবাগান ছুঁয়ে গেলে গাছের পাতা কুঁক্‌ড়ে ডগা লটকে যায়।

প্রকৃতি নিজেই বালিকে দমাবার চেষ্টা করে থাকে। হাওয়ায় উড়ে, জলে ভেসে, পায়ের কাদায় পাখির ময়লায়, নানা উপায়ে ঘাসের গাছের বীচি তুনিয়াময় চলাফেরা করে। কিন্তু বালির মধ্যে শিকড় গেড়ে গজিয়ে ওঠার বিঘ্ন অনেক। অকালে অস্থানে পড়লে বীচি শুখিয়ে যেতে পারে; যথাস্থানে পড়লেও বাতাসে সরিয়ে ফেলতে পারে, বালিচাপা দিতে পারে।

কারাকুমের "কান্দিম" নামের এক রকম লতানে ঘাস কী ক'রে নিজের কাজ উদ্ধার করে, তার কথাটাই বলি। এ ধরনের ঘাস বা আগাছা আমাদের বেলে- জায়গায়ও দেখা যায়।

কান্দিমের বীচি ছোট্টো ফাঁপা গোলার মতো, তার গা-ময় কাঁটা। সে শুখনো বালির উপর পড়লে হাওয়ার সঙ্গে গড়িয়ে বেড়ায়, যতক্ষণ না রস জোটে। বাতাস যদি বালি ঝেঁটিয়ে এনে তাকে চাপা দেবার যোগাড় করে, হালকা বলটা ফুরফুর ক'রে বালির আগে আগে উড়ে চলে। রসা জায়গায় পৌঁছলে কাঁটাগুলো গেঁথে যায়, বীচি আর ন'ড়ে বেড়াতে পায় না। সে অবস্থায় যদি চাপা পড়ে তখন কান্দিমে-বালিতে লাগে রেশারেশি, বালির ঢিবি বাড়ে তো ঘাসও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কান্দিমের গাঁঠে-গাঁঠে শিকড়, উপরের চাপ সত্ত্বেও সে তাই দিয়ে তলার বালিকে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলে। পরে কোনো সময় জোর বাতাস উঠে উপরের ঢিলে বালি সরিয়ে ফেললে, শিকড়ে বাঁধা ডুমো ঢিবিটা ঘাসের গোচ্ছা মাথায় পরে জ'মকে বসে থাকে।

এ ধাঁচার ঘাস আরো আছে যারা বালিকে হার মানাবার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসে। তবে কি না, এরা হারিয়ে নিজেরা হারে; বাড় বাড়ে, কিন্তু বংশ রাখতে পারে না। তার কারণ, একবার পুরোনো পাতা ঝরাতে আরম্ভ করলে সেগুলো প'চে বালির উপর একটা

সারালো আস্তরণ বিছিয়ে দেয়, যাতে ক'রে বর্ষার জল তাড়াতাড়ি শুখোনো বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার উপর অন্য গাছের বীজ লাগার সুযোগ পায়, শিকড় নামায়, গাছিয়ে ওঠে, শেষে ঝাঁকড়া পাতার আওতায় মারে সেই আগেকার ঘাসের দলকে। ক্রমশ বড়ো গাছের জঙ্গল ফলাও হলে আবহাওয়া বদলে গিয়ে মরু উদ্ধার পেয়ে যায়।

মরু-দমনের ইতিহাসটা যদিও দু' কথায় ব'লে ফেলা গেল, কিন্তু আসলে ঘটনাগুলো পর পর ঘটতে সময় লেগে যায় যুগপরিমাণ। মানুষের কিন্তু অত তর সয় না, নিজের আয়ুর মধ্যে কাজ সারতে না পারলে ফলটা ভোগে আসবে কার ?

তারো উপায় আছে। রুশের মরু-রেল-লাইনের কোনো কোনো স্টেশনে দেখা যায়, কুলীরা যাত্রীদের কাছে কত রকম বিদেশী ফল তরকারি বিক্রি করতে আনে। তবে কি সেখানে কোনো কৃষিতত্ত্ববিদের আস্তানা ?—না, সেখানে যাদুকরও থাকে না। রেলের সঙ্গে সঙ্গে কি না জলও চ'লে এসেছে, তাই স্টেশনের কর্মচারীরাই ইচ্ছেমতো ফল ফলাতে পারে। মরুর চেহারা তড়িঘড়ি ফেরাতে, মানুষের উপযোগী করে তুলতে জলই সহায়।

মহাভারতের যুদ্ধ আঠারো দিনে কাবার হয়েছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে একশ' বছরের যুদ্ধেরও খবর আছে। মানুষে-মরুতে হাজার হাজার বৎসর ধরে যুদ্ধ চলেছে। সেদিন মধ্য-এসিয়ার বালির নিচে কতকগুলি ভাঙাচোরা জল-চলার বাঁধানো নহর বেরিয়েছে, যা একজন মার্কিন পণ্ডিত অনুমান করেন, দশ হাজার বছর আগেকার তৈরি। তখন তো যন্ত্রপাতি বড়ো একটা ছিল না, দূরের পাথর মজুরের হাতে পিঠে মাথায় করে এনে বসাতে হয়েছিল, তাতে কর্তাদের চাবুকের সাহায্যও তারা কিছু পেয়ে থাকবে। এমন আরো কত পুরা-কীর্তির

অবশিষ্ট জায়গায় জায়গায় পাওয়া যায়। এত কষ্টে গড়া জিনিস মানুষে নষ্ট হতে দেয় কেন।

তাতে প্রকৃতির হাত কিছু থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের নিজের দুর্বুদ্ধি নির্বুদ্ধিতা আসলে দায়ী।

রাজাদের দিগ্বিজয় কাহিনী বেশ চটকদার করে লেখা হয়, কিন্তু তলিয়ে দেখলে তাদের কার্যকলাপ মোটেই মনোরম নয়। তারা বেরত কোনো সুদূর ধনের লোভে লোভে, মাঝপথে বাধা পেলে হন্যে হয়ে উঠত। যোদ্ধার সাজসজ্জা ছাড়িয়ে ফেললে ভিতরে বেরিয়ে পড়ে নিছক গুণ্ডা, বিপক্ষকে যেমন-তেমন করে কাবু করা বৈ সে কিছুই বোঝে না। সে জানে জলের নহর ভেঙে দিলে মরুবাসী রাজা একেবারে কাবু। তখন তার এলাকার ভিতর দিয়ে লুটপাট করে চলে গেলেও তাকে নিরুপায় হয়ে সইতে হবে; পরে প্রজা বাঁচুক মরুক বিজয়ী বীর তার থোড়াই তোয়াক্কা রাখে। পুরোনো কীর্তিনাশের এই এক কারণ।

আর এক কারণ হচ্ছে কর্মকর্তার নিজের আহাম্মকি। জমির রকম না বুঝে জল হুড়মুড় করে এনে ফেললেই তো কাজ হয় না, আশ-পাশের চেয়ে জমি যদি নিচু হয় তবে তো মজে হেজে গিয়ে বসবাসের বার হয়ে যায়। তখন তৈরি নহরের মায়া কাটিয়ে স'রে পড়া ছাড়া গতি থাকে না, শেষে মরা নহরের উপর খাঁড়ার ঘা দেবার ভার পড়ে প্রকৃতি-দেবীর উপর।

আচ্ছা, সেকালে না হয় মানুষের সুবুদ্ধির উদয় হয়নি, বিদ্যেও গজায়নি, তাই তাদের প্রাণপণ অধ্যবসায় সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক জমি পতিত হয়েই রইল। কিন্তু তার পরে তো ছটফটে রাজাগুলো

যে-যার রাজ্যে থিতিয়ে বসল, বিজ্ঞান ও হাজির হল মানুষের খিদমত করতে ; তবু কেন যে-মরু সেই-মরু খাঁ খাঁ করছে।

ইমারত যত উঁচু, ভিত তার মতো-মতো চওড়া না হলে যা হয়, মানুষের সেই রকমের দশাটা হয়েছে—তার হৃদয় উদার না হতেই বুদ্ধিটা বেজায় চড়ে গেছে। মানুষে মানুষে ভালোবাসার টান না থাকলে বুদ্ধিকে বাগ মানাবে কী দিয়ে। তাই মাঝে মাঝে হালছাড়া বিজ্ঞানের কেরামতি দেখে অবাক হতে হয়—দুঃখ না হলে হাসি পেত।

সবে সেদিন খবরের কাগজে পড়া গেল মার্কিনদেশে দর বাড়াবার জন্যে হাজার হাজার বস্তা গম পুড়িয়ে ফেলার অদ্ভুত কাণ্ড।

য়ুরোপেরও একটা গল্প বলি। ১৯৩৪ সালে জর্মানীর বিজ্ঞানের ঠেলায় গমের এমনি ফলন হল যে, দেশের লোকে খেয়ে শেষ করতে পারে না, পাঠিয়ে দিলে দিনেমার-গোরুকে খাওয়াতে। সেখানে আবার গোরু এত বেড়ে গেল যে, গো-খাদক জাতেও তার সদ্ব্যবহার করে উঠতে পারল না, কলে পিশে তাদের হাড়েমাসে পিণ্ডি পাকিয়ে ওলন্দাজ শুয়োরের খাবার বলে চালান গেল। সেখানে শুয়োর বংশের বাড়াবাড়ি আরম্ভ হওয়ায়, শুয়োরখেকোরও হল অরুচি, শুয়োর মেরে সার দিতে লাগল নতুন আবাদী জমিতে,—যাতে আবার বোনা হল গম। বলিহারি যাই চক্করের বাহার :

> সার দিয়ে বেড়ে যায় গম
> গোরুতে খায় সেই বাড়তি গম
> বাড়তি গোরু দিয়ে খাওয়াল শুয়োর
> খেতের সার হল বাড়তি শুয়োর

আবার বেড়ে যায় গম—
টাকডুমাডুমডুম্।

ভেদবুদ্ধিই হয়ে আসছে মানুষের কাল। যে-যার নিজের দিকে টানাটানির চোটে যা উৎপন্ন হতে পারত তা হয় না, যা হয় তাও ফেলা-ছড়া যায়।

১৯২৭ সালে লেখা এক জর্মন পণ্ডিতের মন্তব্য চুম্বক করে দিলে আয়েবটা ফুটে উঠবে—"মরুকে উর্বর করার চেষ্টায় সমূহ বিপদ। জমি নিয়ে ফসল নিয়ে হবে কাড়াকাড়ি, বাধবে শেষটা লড়াই। এক জায়গার আবহাওয়ার না হয় উন্নতি করা হল, আর এক জায়গায় তাতে উলটো ফল হতে পারে, তারা করবে চেঁচামেচি, সেও গড়াবে যুদ্ধে। দূরের লোকের কথা ছেড়েই দাও, প্রতিবাসীর বাড় দেখলে প্রতিবাসীরাই খুনোখুনি লাগিয়ে দেয়।"

আর এক কথা, "এ উপকার করতে যাওয়া চলে না," "ও অভাব মোচন করা পোষায় না"—আজকালকার রাজনীতির এ সব বুলির মানে আর কিছু না, যে কর্তৃপক্ষ এ রকম কাজে হাত দেবে তাদের ঘরে কিছু আসবে না। কর্তার ইচ্ছে কর্ম, কর্তার লাভই লাভ। চলতি তন্ত্রে সকলের সমৃদ্ধি বলে কোনো জিনিসই নেই।

নারায়ণকে ভালো না রাখলে নরনারীর মঙ্গল নেই, এ সোজা কথা আজকাল যেন একটা অদ্ভুত রহস্যের মতো শোনায়—লোকে আঁতকে, কিম্বা হেসে ওঠে। অথচ, এই কথাটুকু না বোঝায়, দুনিয়ার তিন ভাগ মানুষ আধপেটা খাচ্ছে, অনেকের তাও জুটছে না। এ দিকে বিজ্ঞানীরা বলেন, নতুন বিদ্যেসাধ্যি কিছু না খাটিয়েও পৃথিবীর জলস্থল থেকে মিলেমিশে করলে যা উৎপন্ন হতে পারে, তাতে পৃথিবীর লোক চারগুণ বাড়লেও তাদের খাওয়াপরা চলতে পারে।

USSR ঠিকই বুঝেছেন। যা কিছু যোগাড় আছে, বা হতে পারে, সে সবের হিসেব ক'রে দরদ দিয়ে পরিবেশন করাই আসল উপায়।

সেজন্যে USSR দলে দলে বিশেষজ্ঞ কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। কেহ দেখছেন মাটির উপরের ব্যবস্থা,—চল্‌তি ফসল পুরো ফলানো, অন্য ভালো ফসল আনানো, কেহ খুঁজছেন প্রকৃতির গচ্ছিত ধন মাটির তলা থেকে কোথায় তোলা যায়; কেহ আসমানের জল নামিয়ে আনবার ফন্দি আঁটছেন, কেহ জমিনে জল চারিয়ে দেবার ফিকির ঠাওরাচ্ছেন; কেহ বা সূর্যের তেজ, আগুনের তাপ খাটিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের মতলব ফাঁদছেন; দিন নেই, রাত নেই, আপনা-ভুলে তাঁরা জনগণের হিত-চিন্তায় লেগে আছেন,—এর-ওর-তার টাকা লাভের আশায় নয়, সমবেত সমাজের কল্যাণকল্পে এ সাধনা।

একেই বলা যায় যোগ। শুধু বিশেষজ্ঞের কেন, সংঘের সকলেরই চিত্তের ভাবনা, হৃদয়ের বেগ যেন রাশ টেনে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে নিজের চারদিকে ক্রমান্বয় চক্কর না খেয়ে সমাজের সমৃদ্ধিতে তারা নিজের বৃদ্ধি বোঝে, সে উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার উৎসাহ পায়, সকলের ভাবী-উন্নতির জন্যে প্রফুল্ল মনে নিজের বর্তমান কষ্ট স্বীকার করতে পারে।

তাতেই ভরসা হয়, হাজার বৎসরের দাপাদাপিতে যা হয়নি, এঁদের পাঁচ-পাঁচ-বছরের সুসম্বদ্ধ চেষ্টায় তা হয়ে উঠবে— মরুকে এঁরা মাটি করে ছাড়বেন।

ব্যবস্থা করে জল আনতে লাগাতে পারলে মরুভূমিকে ফলন্ত করা যায়, এ কথাটা নতুন নয় ; জল আনার চেষ্টাও অনেক দিনের, তাও তো দেখা গেল। এক জোট হয়ে সব রকম বিঘ্নে খাটানোটাই নতুন ; আরো নতুন তার উদ্দেশ্য— সংঘবদ্ধ মানুষের উপকার, যে সংঘের মধ্যে জাতিভেদ নেই, যার মূল-মন্ত্র মানলে কোনো সমাজের তার মধ্যে ঢুকতে মানা নেই।

স্বর্গেমর্ত্যে পাতালে জল তো সর্বত্র। আকাশে জলের অদৃশ্য ভাপ উঠে মেঘ-কুয়াশা হয়ে দেখা দেয়। সমুদ্র ছাড়া, মাটির উপরের জল থাকে জমির খাঁজে নদী, গহ্বরের ভিতর হ্রদ, পাহাড়ের উপর বরফ হয়ে। মাটির তলার জল কোথাও চুঁয়ে চুঁয়ে ধীর স্রোতে চলে, কোথাও গুহায় গর্তে স্থির থাকে। কেমন ক'রে এই সব জলকে মানুষের দরকার মতো হাজির করা যায়, USSR-এর সেই ভাবনা।

স্বাভাবিক উৎস বাদে, পাতকুয়ো, নলকুয়ো, বাঁধা ইঁদারা, এই সব হল পাতালের জলে পৌঁছে তাকে উপরে টেনে আনার মামুলি রাস্তা। মরুর মধ্যে কোনো জায়গায় উৎস থাকলে তার কাছে মানুষ বসতি করে আসছে, আশপাশে কিছুদূর পর্যন্ত নিজের খোঁড়া কুয়ো ইঁদারা দিয়ে চাষের কাজ চালাচ্ছে, এই তো সেকেলে বন্দোবস্ত। কিন্তু কুয়োর উপর কুয়ো বাড়িয়ে জলের জোগাড়ে মরুকে ঝাঁঝরা করে ফেলা,— এ কালের সে পন্থা নয়।

বাঁধানো নহরে-আনা জল পেলে, মানুষের পক্ষে যানবাহন নিয়ে মরু পারাপার করার উপায় হয় বটে, কিন্তু সে জল দুধারের জমির কতটুকুই বা ভেজাতে পারে, তেপান্তর বালির ভিতর দিয়ে বড়ো জোর

একটা উর্বর রেখা টেনে যায়। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া রুশের মরুর আবাদ কি তার উপর নির্ভর করে চলতে পারে। কাজেই নহর বাড়ানোর চেষ্টাও বড়ো একটা চলছে না।

তবে জাহাজে ক'রে জল আনা হবে না কি। তামাশার ভিতর এক এক বার সত্যি কথা থেকে যায়। কাশ্যপ সাগরের এক কোলের ধারে মরুর মধ্যিখানে ক্রাস্নোভডস্ক ব'লে এক শহর আছে— বাংলা অক্ষরে লিখলে যার নাম উচ্চারণের অসুবিধে বাড়বে বৈ কমবে না— সেখানে নোনা জলের ছড়াছড়ি, খাবার মতো এক ফোঁটাও মেলে না। কাজেই সাগরজলের নুন বাদ দিয়ে পানীয় জল কলে তৈরি করে নিতে হয়। কল বিগড়ে গেলে, মেরামত না হওয়া পর্যন্ত সাগর পার থেকে জাহাজে জল আনে; ইতিমধ্যে খাবার জল টাকায়-সের বিকোয়। তাই বলে কেহ কি মনে করবে, মাঝ-মরুতে জল পৌঁছে দেবার এটা এক উপায়?

বরফ-পাহাড়ে অফুরন্ত জল জমাট বেঁধে আছে। প্রকৃতির দেখা-দেখি ঐ জলের ভাগ নদী দিয়ে দরকার মতো আনতে পারলে একটা উপায়ের মতো উপায় হয় বটে— ভগীরথ-ইঞ্জিনিয়র যে-কৌশলে গঙ্গার ভাগীরথী শাখাকে বাংলা দেশের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিলেন। USSR ঐ ধরনেরই পথ ধরেছেন। তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ঋষিতুল্য না হলেও, তার অভাব ভূতত্ত্ব-পুরাতত্ত্ব চর্চা দিয়ে পূরণ করে নিয়েছেন।

আরো সুবিধে হয় যদি যে-খেপে জোলো হাওয়া সাগর থেকে ডাঙার উপর দিয়ে পাহাড় পর্যন্ত চলে তার জলের বোঝা এখানে-ওখানে ইচ্ছে-মতো খসিয়ে নিতে পারা যায়, তাহলে আনা-নেওয়ার পথ বল, সময় বল, ঝঞ্ঝাট বল, অনেক বেঁচে যায়। খাণ্ডবদাহের সময় অর্জুন ইন্দ্রের প্রচণ্ড বর্ষণ আটক রেখেছিলেন; বিজ্ঞানীরা দেবরাজের বারিধারা চুরি

করার চেষ্টায় আছেন। আকাশের সে গল্প পরে হবে ; এখন ভূতলের কথা চলুক।

একবার ভূচিত্রকে বায়স্কোপে চড়িয়ে সচল করার কল্পনা করা যাক, যাতে করে ভূগোল-ইতিহাসের খেলা মানসচক্ষে এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে। তবে, যে সব ঘটনা ঘটতে এক-আধ যুগ লাগে সেগুলোকে এক নজরে দেখে নিতে হলে ছবির কলটাকে বেজায় তাড়াতাড়ি চালাতে হবে।

বিজ্ঞানীমহলে একবার কথা উঠেছিল, মার্কিন মহাদেশ ধীরে, অতি ধীরে, এসিয়ার দিকে ঘেঁষে আসছে। কথাটার সত্যিমিথ্যে নিয়ে মাথা বকিয়ে লাভ নেই, আমাদের নাতির নাতির আমলেও ধরাছোঁয়ার মতো কিছু দেখা যাবে না। কিন্তু আমাদের বায়স্কোপে এ কল্পনার ছবি চাপালে মহাদেশ-দুটোর পরস্পরের ঘাড়ে পড়াটা এ পালার মধ্যে দেখে নেওয়া যেতে পারে। আবার উলটো দিকে ঘোরালে এ রকম কাছে ঝুঁকে আসার কারণটাও আর এক বিজ্ঞানীর কল্পনায় প্রকাশ পাবে। তিনি মনে করেন ঘটনাটা সেই পুরা কল্পের, যবে জাঁকালো কোনো জ্যোতিষ্ক অতিথির টানে পৃথিবীর একমাত্র পুত্র চাঁদ, মায়ের কোল ছিটকে বেরিয়ে, প্রশান্ত মহাসাগরের অতল গহ্বরে আপন স্মৃতি রেখে যায়। এই বিপুল ক্ষত ক্রমশ জুড়ে আসাটাই দুই মহাদেশের ক্রমশ কাছাকাছি আসার কারণ। এ সব কল্পনার উপর ঝোঁক না দিয়ে ভবিষ্যতে ঠোকাঠুকির ফলটা বরং আলোচনা করা যাক।

বিপরীত দিকে চলতি দুই ট্রেন ধাক্কা খেলে যেমন মাঝের গাড়ি-গুলো খাড়া হয়ে ওঠে, মহাদেশের বেলা তেমনি দেখা যাবে, যে-কিনারা দুটো ভীষণ ঠাসে ঠেকবে, তাদের তলায় স্তরে, স্তরে যেসব পাথরের ভিত আছে তারা চচ্চড় ক'রে বেঁকে চুরে ঠেলে উঠবে, মধ্যিখানের

সমুদ্রের তলায় যা-কিছু চুন বালি শামুক ঝিনুক সব মাথায় নিয়ে এক সার পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এইরকমেই একটা ধাক্কায় জন্মেছিল হিমালয়শ্রেণী—এখনো তার চুড়োয় চুড়োয় জলচর শামুক ঝিনুকের খোলস পাওয়া যায়; মাটির ঢাকা খসে গিয়ে তার ভিতরকার স্তর বেরিয়ে পড়লে পাথরগুলোর দুমড়ে খাড়া হওয়ার চেহারা পষ্ট দেখা যায়।

ডাঙায় ডাঙায় ঠেকতেই মাঝে যে জল ছিল তা দুদিকে ছিটকে বেরোবে। দুধারে ডাঙার জমিটা চাপের চোটে কুঁচকে ঢেউ খেলিয়ে যাবে, আলুর খেতের মতো দাঁড়ার পর খাল, খালের পর দাঁড়া। কোথাও জলের নিচে থেকে মাটি জাগবে, কোথাও জল চড়ে এসে মাটি তলাবে। এরকমেরই ঘটনায় কোনো সময় হয়তো এ্যাটলান্টিস্ (Atlantis) দেশ তলিয়ে গিয়েছিল; লোহিত সাগর মাঝে চড়ে এসে আরবে আফ্রিকায় বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে; ওলন্দাজদের দেশ নামিয়ে দিয়ে তাদিকে ত্রাহি ত্রাহি শব্দে বাঁধ বাঁধিয়ে রেখেছে।

এই ভাবেই সমুদ্র পরশুরামকে কোঙ্কন-কেরল দেশ দান করেছিল, আর যাদবকুলের রাজধানী কেড়ে নিয়েছিল।

পাহাড় খাড়া হলে তার উপর বৃষ্টি হবে, বরফ পড়বে, খাঁজে খাঁজে ঝরনা নেমে আসবে, জল নিচে পৌঁছে স্রোতা হয়ে জমির ঢাল ধ'রে ধ'রে চলতে থাকবে। গাছ যে রকম গুঁড়ি থেকে আরম্ভ করে ডাল-পালা ছড়ায়, নদীর বাড় ঠিক তার উলটো, শাখাপ্রশাখা নানা দিক থেকে একস্রোতে জুটলে পর, শেষে গুঁড়ির মতো ভরা নদী জেঁকে ওঠে। প্রথম দিকটা, যাকে নদীর ছেলেবেলা বলা যেতে পারে, নদীতে নদীতে শাখা কাড়াকাড়ি খেলা চলে, একই স্রোতা একবার এর দিকে একবার ওর দিকে যায়। কিছুদূর এগিয়ে, যে-নদী অনেক শাখা নিয়ে

দলে পুরু হয়, সে বুক ফুলিয়ে চলে, নয়তো একহারা হয়ে সরু থাকে।

পাহাড় থেকে মাটি বয়ে নিয়ে আসার সময় তারি পলি ফেলতে ফেলতে নদী দুধারের জমি তাজা রাখে, কিন্তু বুড়ো বয়সে পলির ভারে সে নিজের পথ নিজেই আটক করে, তাই তখন একবার এ পাড় একবার ও পাড় ঘেঁষে তাকে টলতে টলতে চলতে হয়। এই অবস্থা হয়েছে আমাদের বুড়ী পদ্মানদীর, যেজন্যে সে আজ এক পারের গ্রাম ভেঙে অপর পারে চড়া ওঠায়, কাল চড়া কেটে গ্রামের ধারে মাটি ফেলে। শেষকালে নদী সমুদ্রের ভিতর যেসব সার ঢালে তাতে প্রচুর ঝাঁজি শেওলা জন্মায়, সেগুলো মাছে খায়, মাছকে আবার মানুষে খায়। আগাগোড়াই নদী মানুষের সেবক।

কারাকুমের ভিতর দিয়ে চলেছে আমুদরিয়া নদী, সেটা উত্তর-পশ্চিম রোখে চলতে চলতে মাঝে উত্তর দিকে মোড় নিয়ে আরল সাগরে গিয়ে পড়েছে। অনেক কাল আগে এই নদী বরাবর পশ্চিম মুখ ধরে কাশ্যপ সাগরে পড়ত, তার চিহ্ন দেখা যায়। পুরানো চীন ফারসী গ্রীক পুঁথি মিলিয়ে জানা গেছে যে, পাঁচ ছ' শতাব্দী অন্তর এই আমুদরিয়া একবার এ পথ দিয়ে একবার ও পথ দিয়ে চলে আসছে। এখনকার পথটা ১৫৭৫ সালে ধরেছিল. আবার দু'তিন শ' বছর পর কাশ্যপ সাগরে তার ফিরে যাবার কথা।

আরল সাগরের পথে শুধু বালি, নদীর জল পেয়ে তাতে ফসল ফলালেও, নদীর ধারে শহর গড়ে ওঠার সুবিধে নেই। কিন্তু আমুদরিয়া পশ্চিমমুখে চলতে থাকলে, গন্ধক, পাথর-তেল, আরো কারবারের উপযোগী অনেক জিনিস পথে পড়ে। এই সব থাকায় আগের বারে যে শহরগুলো উঠেছিল তার টুকরো-টাকরা আজও বালির মধ্যে পড়ে

আছে। এ পথটাই যদি মানুষের বেশি উপকারী, তবে অতশত বৎসর পর যা ঘটবে, তাকি দু'তিনটি পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের মধ্যে এগিয়ে আনা যায় না ?

তাহলে ভাবতে হয় আমুদরিয়াটা অমন দু-মনা নদী কেন।

হয়েছে কী, বোখারা শহরের কাছাকাছি এসে, আমুদরিয়া পড়েছে একটা দাঁড়-জমির মুখে। সেখান থেকে দুইরোখে দুই খাল জমি চলেছে। নদীটা এখন উত্তরমুখী খাল ধরেছে, তাই থেকে বোঝা যায় এ খালটাই বেশি নিচু। এক ঘড়া জল গড়ানে জায়গায় ঢাললে দেখা যায় ধারাগুলি বেছে বেছে কেমন সবচেয়ে নাবী ঢাল ধ'রে চলে। যদি মাটি চাপা দিয়ে কোনো একটা ধারার পথে বাধা দেওয়া যায়, তখন সেটা অগত্যা কম নিচু পথই নেয়। এই মাটি চাপা দেওয়ার কাজটা নদী পলি ফেলে নিজেই করে।

নদীর ধর্মই হল পতিত-উদ্ধার,—নিচুকে উঁচু, শুষ্ককে সজীব, অহল্যাকে[১] সীতার[২] উপযুক্ত করা। এই ব্রতপালনে আমুদরিয়া চলতি পথটাকে ক্রমশ ওঠাতে থাকে; শেষে যখন তলার সঙ্গে সঙ্গে জলও বেশি উঁচু হয়ে ওঠে, তখন পতিতপাবনী অন্য পথটায় গড়িয়ে পড়েন।

ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো আমুদরিয়ার পালা করে এ-পথ ও-পথ ধরার এই কারণ।

পথ বদলাবদলির হিসেব যদি বোঝা গেল, তাহলে যে পথ চাই সে পথে নদীকে চালাবার উপায়ও ধরা পড়ল। পশ্চিমমুখী খালের চেয়ে নদীর জল উঁচু হয়ে উঠলেই সে কাশ্যপ সাগরের দিকে চলবে,—এই না ? আচ্ছা বেশ, তবে পলি-পড়ার পথ চেয়ে বসে না থেকে, বাঁধ বেঁধে

---

১ যে জমি শুখিয়ে শক্ত হওয়ায় তাতে হল (লাঙল) চলে না।

২ লাঙলের ফলা।

জলটাকে তুলে ধরলেই তো হয়। ইতিহাসে ভূগোলে তথ্য খোঁজার পারিশ্রমিক এই সহজ উপায়টি USSR পেয়ে গেল।

তবে কিনা, ভাবলেই ভাবনার কারণ জোটে। নদীর কাশ্পিয়ান সাগরে যাবার পথের মধ্যিখানে এক প্রকাণ্ড গাড়া আছে, যেটা নদীর জলে ভরে গেলে একটা মস্ত বড়ো হ্রদ হবে—আগে তাই ছিল, তার লক্ষণ পাওয়া যায়। এ পথে নদী চালালে এই গহ্বর ভরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে, পরে ওপার দিয়ে নদী বেরিয়ে চলতে কত বৎসর যে কেটে যাবে তার ঠিকানা নেই। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হলে খাদের ভিতর দিয়ে দুই পাড় বাঁধাই করে নদীকে ওপারে আস্ত পৌঁছে দিলে তবেই পাঁচ সাত বছরের মধ্যে ওর কাশ্পিয়ান-সাগর সংগম ঘটবে। তখন সেই ক্র্যাস্নোভড্স্ক্ শহরে আর জাহাজে করে খাবার জল আনা লাগবে না।

কাশ্পিয়ান সাগর রুশের মহা উপকারী জলাশয়—পুব-দক্ষিণের লুআঁধি থেকে অপর পারের উর্বর প্রদেশের ফসল বাঁচিয়ে রাখে বলে নয়, সমস্ত রুশরাষ্ট্রের আদ্ধেক মাছ সরবরাহ করে। তবে মুশকিল হয়েছে কী, এ সাগর আর সাগর নেই, হয়ে গেছে হ্রদ। যে সময় ভারতবর্ষের মাথায় হিমালয় পাহাড়ের সার ঠেলে ওঠে, এ ঘটনাও সে সময়কার। বার সমুদ্রের সঙ্গে যে যোগ ছিল, তা বন্ধ হওয়া অবধি এর জমাখরচের হিসেব গোলমাল হয়ে গেছে।

সাগরজলের খরচের মধ্যে— যে-ভাপ হাওয়ায় টেনে নেয়; জমার মধ্যে— যে-জল নদীগুলো ফিরে আনে। সব সমুদ্র সব নদী ধরলে জমাখরচের মিল থাকে, জল মোটের উপর কমেও না বাড়েও না; সমুদ্রে সমুদ্রে যোগ থাকায় এক সময় কোথাও বেশ-কম হলে স্রোত চলে ঠিক করে দেয়।

কিন্তু হ্রদ যদি আপনাকে আপনি সমান না রাখতে পারে, তাহলে ক্রমশ শুখোয়। হাওয়া তো জল টানতে কসুর করে না, যত ফলাও পায় তত টানে। জলের সে ক্ষয় সমুদ্র থেকে পূরণ না হওয়ায় যে ক'টি নদী ভিতরে এসে পড়ে তারাই ভরসা। জল যেমন কমে, হ্রদের প্রসারও কমে, তাতে হাওয়ার জল-টানার ক্ষেত্রও কমে। শেষে উবে-যাওয়া জলে নদী-আনা জলে সমান সমান হলে, হ্রদের একটা লেভেল দাঁড়িয়ে যায়।

কাশ্যপ সাগরের হয়েছে সেই দশা। একঘরে হবার পর থেকে শুখোতে শুখোতে আসল সমুদ্রের লেভেল থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত নেমে গেছে, এখনো অল্পে অল্পে নামার দিকেই চলছে। কিন্তু আর কমে গেলে জল এত নোনা হবে যে, ভালো মাছ আর টিঁকবে না; ধারে যেসব বন্দর আছে তা থেকে জল সরে গেলে তারা কাজের বার হয়ে যাবে; রুশের বাসিন্দারা নানান ফেরে পড়বে। তাই USSR-এর রায় বেরিয়েছে—"কাশ্যপ সাগরকে জল খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

পুবদিক থেকে আমুদরিয়াকে আবার এনে ফেলার কথা তো বলা হয়েছে। পশ্চিম দিকে আপনি এসে পড়ছে মস্ত লম্বা বল্গা নদী। এমনিতেই বড়ো-সড়ো হলেও এর জল আরো বাড়াবার প্রস্তাব হচ্ছে। এধার ওধার থেকে শাখা টেনে নিয়ে তা কতক হতে পারত, কিন্তু জাঁকালো ভাবে কাজটা না করলে USSR-এর উপযুক্ত হবে কেন।

রুশের যে অংশ য়ুরোপের মধ্যে পড়ে, তার উত্তর সীমায় শ্বেতসাগর আর উত্তর-মহাসাগর; দক্ষিণ সীমায় কাশ্যপ-সাগরের মাথা, আজব সাগর আর কৃষ্ণসাগর। এ প্রদেশের মাঝামাঝি পুবপশ্চিম লম্বা এক অধিত্যকা আছে, যার থেকে দক্ষিণমুখী বল্গা নদী পুব ঘেঁষে কাশ্যপ-সাগরে পড়ে, আরডন নদী পশ্চিম দিয়ে আজব-সাগরে গিয়ে পড়ে।

এই নদী দুটো আঁকতে-বাঁকতে এক জায়গায় অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে, সেখানে খাল কেটে যোগ ক'রে দিলে ডনের অনেক জল বল্গার ভিতর দিয়ে কাশ্যপ সাগরকে দেওয়া যায়।

কিন্তু রোসো। তাতে উদোর গাঁট কেটে বুদোর পকেট ভারি করা হবে না তো ?

না, সে ভয় নেই। নদীর জল ক'মে গেলেও আজব সাগরের তত যায় আসে না, কারণ সে সত্যিকার সাগর, কৃষ্ণ সাগরের ভিতর দিয়ে বার সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ আছে।

তা যেন হল কিন্তু যে জমি ডন-নদীর জলের উপর নির্ভর করে তার কী হবে।

সে ভাবনাও করা হয়েছে। জমাখরচ খতিয়ে দেখা গেছে, ডনের বিস্তর ফালতো জল আছে. যা আসল কাজে না লেগে বাজে বন্যায় লোকসান হয়ে যায়। তবুও আজব-সাগরের বড়ো বড়ো চিংড়ি কাঁকড়ার খোরাকের কমতি না পড়ে, সেটা মনে রেখে ডনের জল নেওয়া হবে।

মাথা যদি ঘামানোই হল, তবে একা ডন-নদী নিয়েই বা কেন। ঐ প্রদেশে আরো কত নদী আছে। ছোটোগুলি ছেড়ে দিলেও, মাঝের সেই উঁচু ভূমির উত্তর দিয়ে ডুইনা-নদী শ্বেতসাগরে আর পেটচোরা নদী উত্তর মহাসাগরে চলেছে। অন্য ডাঙার মতো অধিত্যকার জমিও দাঁড়ে খালে ঢেউ-খেলানো। তবে দাঁড়াগুলো কোথাও পাহাড়ের মতো, কোথাও বা উঁচু মাঠ হয়ে রয়েছে; লম্বা টানা খালে স্রোতা বইছে, চওড়া গহ্বর বিল হয়ে আছে। এই রকমারি অবস্থার সুযোগ নিয়ে, কতক কেটে, কতক বেঁধে যদি দু'একটা বড়ো গোছের হ্রদ তৈরি করা যায়, যাদের সঙ্গে লক-গেট দিয়ে উত্তরবাহিনী দক্ষিণবাহিনী যত ছোটো বড়ো নদী সব যোগ করা থাকে, তাহলে কৃষ্ণসাগর থেকে শ্বেতসাগর

পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা এক জল-পথের জাল তৈরি হয়, যাতে ক'রে বাণিজ্যের উপর বসে লক্ষ্মী অনায়াসে রাষ্ট্রের এপার ওপার চলাফেরা করতে পারবেন।

তা বাদে পঞ্চবার্ষিক সংকল্প চালাবার কেমন সুবিধে হবে ভাবো দেখি।

কয়েদীর মতো মাটিতে-শিকল-বাঁধা চাষা, আকাশ পানে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে-থাকা চাষা,—এদের দিন আর থাকবে না। USSR-এর জাদুকাঠির পরশে চাষা হয়ে উঠবে নানা বিঘ্নেশ্বর ইঞ্জিনিয়ার। এ-গেট খুলে সাগরে জল ভরো, মাছ বাড়াও ; ও-গেট খুলে মরু ঠাণ্ডা করো, ফসল বাঁচাও ; সে গেট বন্ধ রেখে প্লাবনের জড় মারো— একাধারে সে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের প্রতিনিধি হয়ে এমন সব হুকুম জারি করতে থাকবে।

এ রকমের বিরাট উদ্যম আমাদের ছন্নছাড়া দেশে সম্ভব হলে, তাতে যদি সিকিম-ভোটানের মাঝখানের দুয়ার দিয়ে তিব্বতের নানা নদীর উদ্‌বৃত্ত জল সাহেবগঞ্জের কাছ বরাবর গঙ্গায় আনা যেত, তাহলে অন্তত বাংলার নদীগুলো আজ শুখিয়ে মরতে বসত না।

নদীকে এধারে ওধারে চালাতে হলে বাঁধ বাঁধাই সেরা উপায়। কিন্তু যে দেশে উঁচু নিচু, শক্ত নরম হরেকরকমের জমি, সেখানে অনেক দেখে শুনে এ কাজ করতে হয়। বালির বাঁধের বিপদ তো জানাই ; তলায় মরা পাথর আছে কি না তাও দেখা দরকার নইলে ধসে যাবার ভয় ; নিচের মাটি যদি ফোঁপরা থাকে জল চুঁইয়ে বেরিয়ে গিয়ে কাজ নষ্ট। তা বলে, বাঁধ মজবুত হলেই যে ঝঞ্ঝাট মিটল, তাও নয়।

মনে করো এক বাঁধবিৎ ঘাড়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে অনেক খুঁজে পেতে

নিরাপদ জায়গা পেয়ে মিস্ত্রী-মজুর আনার উদ্যোগ করছে, হেনকালে লম্বা পুঁথি বগলে মাছবিৎ এসে বচসা লাগালে :

"কী করা হচ্ছে ?"

"বাঁধ বাঁধছি, মশায়।"

"এখানে বাঁধ ?"

"আজ্ঞে, তলা পরখ করেছি, ঠিক আছে।"

"রেখে দিন আপনার তলা ! মাছের কী হবে তাই ভাবুন। পেটে ডিম নিয়ে যে মাছ উপরে উঠছে, তাদিকে এখানে আটকে দিলে ডিম পাড়বে কোথায়, পোনাই বা বাড়বে কোথায়। নদী নিয়ে ছেলে, খেলা করলে জীবের প্রাণ যাবে।"

"আচ্ছা, অত কথায় কাজ কী, আমাদের দুজনেরই মনের মতো জায়গা দেখা যাক।"

ঘোরাঘুরি ক'রে যদি তা পাওয়া গেল তখন কাগজের তাড়া হাতে চাষবিৎ এসে খেঁকিয়ে উঠল :

"বলি, এখানে জল উঁচু করলে বর্ষার সময় তল্লাট হেজে যাবে যে। তখন দেশে কত হাজার বস্তা ফসল ঘাটতি হবে, সে খবর কি রাখতে নেই।"

"বেশ, বেশ, আপনি না হয় ঠিক জায়গা বাতলে দিন"—

এই বলে তাঁর সঙ্গে রফা হতে না হতে, হাঁ হাঁ করে হাজির হল নাবিক।

"কর্তারা বাজে তর্ক করেন কেন। এখানেই বা কী, ওখানেই বা কী, বিনা-গেটের বাঁধ যদি তোলেন, নৌকো পার হবে কেমনে। জলপথে মাল চলা বন্ধ হলে ঢোলাই খরচে সব খেয়ে নেবে যে।"

নানা-বেত্তা সংকট দেখে অবশেষে সমবায়ী উপস্থিত হয়ে সদরে তার

করলেন—"এদের সবাইকে সভা করে বসানো হোক, নইলে কাজ এগোবে না।"

আমাদের মন-গড়া এ টেলিগ্রামের অপেক্ষা না করেই আলাদা বিদ্যের বিশেষজ্ঞ দলকে USSR এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়ে কাজে হাত দিয়ে থাকেন। সে পরামর্শ সভা কী বৃহৎ ব্যাপার। একটা বড়ো হলেও সবাইকে ধরে না। তাতে ক্ষতিই বা কী। তারা তো মুখে মুখে তর্ক করে না, যে-যার তথ্য সাজানো, যুক্তি দেখানো, আঁক কষা, সবি লিখে হয়; শেষে নেতারা যে কাজের জন্যে যা দরকার তাদের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করে ব্যবস্থা করেন।

বিষয়মোহে জড়ভরত দেশে যেখানে জমির স্বত্ব এক পক্ষের, জলের স্বামীত্ব অপরের; যেখানে একই নদীর কতকটা এক কর্তার তাঁবে, বাকিটা ভিন্ন-এলাকায়, যে যার অধিকার নিয়ে মত্ত, কেও কাওকে পোঁছে না, কেও কাওকে রেহাই দেয় না; সেখানে এমন সব-দিক-দর্শী কল্পনা করাই মুশকিল, কাজে আনা তো দূরের কথা।

USSR-এর বিরাটরাষ্ট্রে তাঁরা ক্ষিতিপতি, সিন্ধুপতি, প্রজাপতি সবই। ভর্তা-পাতা-সর্বস্বখদাতা হয়ে তাঁরা যে ভাবে পতিধর্ম পালনে উঠে প'ড়ে লেগেছেন, তার তারিফ না করে থাকা যায় না।

আকাশের কথা

ঘর বলতে আমরা বুঝি, মাথার-উপর চাল, চার পাশে দেয়াল; চীনেরা বলে মাঝের ফাঁকটাই আসল। আকাশ ফাঁকা, তাই মহান। তাই বলে শূন্য ব্যোমকে ভূতের দলে ফেলার মানে কী হতে পারে। তাকে ভূতের খেলাঘর বললে বরং মানাত।

পঞ্চভূতের বশীকরণ

যাঁরা গগনে বিহার করেন, তাঁদের মধ্যে আগে মনে উদয় হন সূর্য—তাঁকে ধরে দেবতার দলে, তাঁর রশ্মিকে ভূতের মধ্যে, যে ভূত দিয়ে প্রকৃতিমাতা প্রাণশক্তি গড়েন ; তাঁর আজকালকার ছেলেরাও পিছ-পাও নয়, তারা এ ভূত দিয়ে তৈরি করে কলের শক্তি।

স্বাভাবিক অবস্থায় যাকে বলে জলের ভাপ, চাপের মধ্যে জন্মালে তাকেই বলে স্টীম, সে অবস্থায় তাকে জল থেকে বার করতে তাপও লাগে বিস্তর। বিজ্ঞানীদের চেষ্টা চলেছে, আতসী কাঁচের ভিতর দিয়ে গুচ্ছের সূর্যকিরণ জড়ো করে তাদের মিলিত তাতে জলকে স্টীমকরা। স্টীম একবার হলে তা দিয়ে ইচ্ছেমতো যে-কোনো রকমের কল চালিয়ে নেওয়া যায়, এমন কি, সাহারার মধ্যিখানে বসেও বরফ জমানো যায়,—যেমন তপস্যার ঝাঁজে সাধক বাসনা ঠাণ্ডা করতে পারেন।

সূর্যের পরেই মনে পড়ে চন্দ্রকে। তিনি নিস্তেজ হলেও নেহাত শক্তিহীন দেবতা নন। সমুদ্রের জলকে টান মেরে পৃথিবীর উপর দিয়ে জোয়ারের ঢেউ দুবেলা ঘোরান, সেই সঙ্গে বায়ুমণ্ডলেও বাতাসের স্রোত চালান।

বায়ু তো দেব-কে-দেব, ভূত-কে ভূত। অদৃশ্য হলে কী হয়, পবন-দেবের দাপট যে খেয়েছে সে তাঁকে ভুলতে পারে না। বায়ুর ভৌতিক শক্তিকে মানুষ পাল তুলে নৌকো জাহাজ চালাবার কাজে চিরকাল খাটিয়ে এসেছে ; তার উপর, হালে, চাকার মতো পাখা তুলে, পাঁচ রকম কলের মধ্যে, জলতোলা কল তা দিয়ে চালানো হয়ে থাকে, যার সাহায্যে কুয়োর উপকার অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলা যায়।

আর আছেন, মেঘের গায়ে যিনি থেকে থেকে চম্‌কান,—সেই সৌদামিনী। তিনি দেবীও নন ভূতনীও নন ; তার মানে তাঁর সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের ভালো রকম আলাপই ছিল না। এখন আমরা

তাঁকে যুগলরূপা ব'লে চিনেছি। যুগলমিলন হলে তিনি শান্ত অপ্রকাশ থাকেন। মেঘের দৌরাত্ম্যে বিচ্ছেদ ঘটলে, পুনর্মিলনের মুহূর্তে তিনি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হেনে যান, তাঁর বজ্র কখনো বা মানুষের উপরেও এসে পড়ে। সেকালের ভাবুকেরা বজ্রকে ইন্দ্রের হাতিয়ার মনে করায়, বিদ্যুতের কোপকে খেলা বলে ভুল করতেন, তাঁর ক্ষণপ্রভার আড়ালে প্রচণ্ড শক্তি মৌজুদ থাকার খবর তাঁরা জানতে পারেননি।

নামকরণে বিজ্ঞানীরা কিছু বেরসিক। বিজলী যে ভাবেই আমাদের সাক্ষাতে আসুক, সে সতেজে জানান দেয় "আমি আছি" ; তবে তার এক ভাবকে হাঁ-ধর্মী অপরকে না-ধর্মী বলা কেন। বরং এই দুই ভাবের দামী-দামিনী গোছের নাম দিলে সাজত। কিন্তু নাম যাই দিন, কাজ আদায়ের বেলা বিজ্ঞানীরা খুব দড়ো। এই দামী-দামিনীকে আলাদা করে রাখলে তাদের মেলার আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে একথা জানতে পেরে, সেই আবেগের তেজকে মানুষের কাজে আনার অনেক কল-কৌশল বেরিয়েছে। চপলাকে স্থির করে আঁধারকে আলো করা হয় ; বজ্রকে গর্জে ঘাড়ে পড়তে না দিয়ে তার কণিকাপ্রবাহকে তারের নালীর মধ্য দিয়ে সুড়সুড় করে যেখানে দরকার সেখানে পাঠানো হয় ; বৈদ্যুৎকে মানুষের অশেষ রকম খিদ্‌মতে লাগানো হয়। তবে ঠিক মতো তোয়াজ না করলে শ্রমিকও বেঁকে বসে— বিজলীর তো কথাই নেই, তাকে স্ট্রাইক করার ফাঁক দিলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

আকাশ থেকে ফরমাশ-মতো জল ঝরাবার কৌশল পেতে হলে মেঘের জীবনী মনে রেখে সাধনা করতে হয়।

বাতাস বরাবর একটানা বয় না, তা করলে এক জায়গায় হাওয়ার ঘাটতি এক জায়গায় বাড়তি হয়ে গণ্ডগোল বাধত। তাই বাতাস স্তরে স্তরে দিকে দিকে চলে। সূর্যের তাপে সাগর থেকে ভাপ উঠে,

জলের ভিতর গোলা নুনের মতো, হাওয়ায় বেমালুম মিশে থাকে। জল হাওয়ার চেয়ে ভারি হলেও জলের ভাপ তার চেয়ে হালকা, তাই জোলো হাওয়া পাতলা হয়ে উপরে উঠে ডাঙার দিকে বইতে থাকে। পাহাড়ে ঠেকে জল ঝরাবার পর হাওয়া শুখিয়েও যায় ঠাণ্ডাও হয়, তাইতে ভারি হয়ে নিচে নেমে সমুদ্রের দিকে ফেরে। আসলে, কিন্তু যাতায়াতের পথ ছুটো এত সোজাসুজি নয়,—পৃথিবীর পাক খাওয়া আছে, মেরুর বাঁধা ঠাণ্ডাই আছে, মরুর আগুনের ঝল্কা আছে, সমুদ্রের সামঞ্জস্য-গুণ আছে,—এত রকম ক্রিয়ার ফলে হাওয়ার পথ জটিল হয়ে পড়ে।

যেমন করেই চলুক, ছুই বিপরীত বাতাসের ঠেকাঠেকি হলে ঠাণ্ডা ভারি হাওয়ার ঠেলায় জোলো হাওয়া আরো উপরে উঠে যায়। পাহাড়ে যারা চড়ে তারা জানে ক্রমে উঠতে থাকলে ধাপে ধাপে কেমন ঠাণ্ডা বাড়ে। তাই ভাপ উঁচুতে উঠলে ঠাণ্ডায় জ'মে আবার জল হতে চায়। কিন্তু চাইলেই তো হয় না, জলের বসবার জায়গা দরকার করে,—যেমন নিচের হাওয়ার জল শীত পড়লে শিশিরবিন্দু হয়ে ঘাসে পাতায় বসে। আকাশে সে রকম জায়গা পাওয়া যায় ধুলো-ধোঁওয়ার কণার উপর, যারা বৈছ্যৎ সংগ্রহ করায় উপরে চড়ে যেতে পেরেছে। ঠাণ্ডা ভাপ ধুলোর আসনে বসতে পেলে জলের কণা হয়ে দেখা দেয়,—মাটির কাছাকাছি থাকলে তাদিকে বলে কুয়াশা, উপর আকাশে থাকলে মেঘ! কতকগুলি মেঘের কণা মিশে জলের ফোঁটা বাঁধলে আকাশে আর ভেসে থাকতে পারে না, হাওয়ার চেয়ে ভারি হওয়ায় ধরায় ঝরে পড়ে। কিন্তু মেঘের কণার সঙ্গে থাকে, দামী হোক দামিনী হোক, একটি করে বৈছ্যৎকণা— তারা না মিললে জলের কণারাও মিশতে পায় না। সে অবস্থায় মেঘ মেঘই থাকে, জল হয়ে বর্ষায় না, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে রঙের বাহার দিয়ে ঘুরে বেড়ায়,— তাতেই কবির মন সরস হয় বটে,

কিন্তু চাষার পোড়া প্রাণ জুড়োয় না। বৈদ্যুতের যুগল ধর্ম এই যে, দামীতে দামীতে নয়, দামিনীতে দামিনীতে নয়, মেলে শুধু দামী-দামিনী। তাই মিলনানন্দের বারি ঝরাতে হলে বিপরীত ভাবের বৈদ্যুত ভরা দুই মেঘের সাক্ষাৎ লাভ হওয়া চাই,—তবেই বিরহের ঝাঁজ উৎসবের রোশনাই আর দামামা বাদ্যে মেটে।

কিছু কাল আগে, আকাশে ক্রমাগত আতশ-বাজি উড়িয়ে, উপর মুখে কামানের আওয়াজ করে, হাওয়ায়-মেশা ভাপকে জল করার চেষ্টা হয়েছিল। সারাদিন ধুন্ধুমার কাণ্ডের পর, সন্ধ্যে নাগাদ ফোঁটা কতক বৃষ্টি হল বটে, কিন্তু মজুরি পোষাবার মতো মোটেই নয়। বিজ্ঞানীদের কিন্তু মাকড়সার স্বভাব। তাদের মনের মধ্যে যে সব থিওরি ভন্ ভন্ করে বেড়ায় সেগুলোকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনতে পরীক্ষার যে জাল পাতেন, তা বার বার ছিঁড়ে পড়লেও তাঁরা ছাড়েন না। তাঁদের মহামন্ত্র হচ্ছে try, try, try again! মেঘের কাছে ইচ্ছা-বৃষ্টি-বর আদায় না করে বিদায় নেবেন না, এই ভীষণ পণ করে তাঁরা লেগে আছেন।

তার পর বেরল এরোপ্লেন। তাতে করে উপরে ওঠা তত শক্ত নয়, উপরে নিরাপদে থাকাটা সব সময় ঘটে না।

কেন, মুক্ত আকাশে আবার কিসের বাধা।

এক বিঘ্ন হচ্ছে মেঘ। তার মধ্যে ঢুকে পড়লে দিকভ্রম হতে পারে, দামী-দামিনীর মাঝে পড়ে এক চোট বজ্র খেতে হতে পারে, পর পর ভারি-হালকা হাওয়ার বিভ্রাটে যন্ত্রটি মাটি পানে হঠাৎ ছোঁ মারতে পারে। এই সব বেগতিক দেখে মেঘের সঙ্গে এরোপ্লেন-চালকের লাগল ঝগড়া।

সেই হাপায় পাঁচ রকম পরীক্ষা করতে করতে একজন এরোপ্লেন-হাঁকিয়ে মেঘের ভিতর এক বস্তা নুন ছিটিয়ে দিলে, তাতে তিন-চার মাইল-জোড়া মেঘ দেখতে দেখতে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বৃষ্টি আনার

হিসেবে এটা অবশ্য উলটা-বুঝা-রাম গোছের হল, কিন্তু অতিবৃষ্টি বন্ধ করার উপায়ও তো ফেলনা নয়।

ক্রমে যুদ্ধের দায় ঠেকে এরোপ্লেন থেকে গাঢ় ধোঁয়া উড়িয়ে নিজ-পক্ষের সেনাকে শত্রুর চোখের আড়াল করার ফন্দি আবিষ্কার হল। সম্মোহন বাণ মেরে অর্জুন যেমন কৌরব মহারথীর দলকে ঘুম পাড়িয়ে-ছিলেন, তেমনি আকাশ থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া ছেড়ে বিপক্ষের চির-নিদ্রার ব্যবস্থাও হতে লাগল। এই ধোঁয়া-চালানো কেরামতির সুবিধে পেয়ে USSR তাকে কাজে লাগাবার উদ্যোগ করলেন— মানুষ মারতে নয় লোকের হিতার্থে।

বিজ্ঞানীর উপর হুকুম হল, "যাও এরোপ্লেনে, অপকে খুশি করে ক্ষিতির জন্যে বকশিশ নিয়ে এসো।"

তখন চললেন বিজ্ঞানী, মেঘ-কণাদের জোড় মেলাবার বন্দোবস্ত করতে। এরোপ্লেন যখন মেঘরাজ্যে প্রথম চক্কর খেল, তখন সব শুখনো, মেঘের জল মেঘেই লেপ্টে রইল, না লাগল প্লেনের বা চালকের গায়। বিজ্ঞানীর সঙ্গে ছিল বিপরীত বৈদ্যুৎ-ভরা ধোঁয়া ওড়াবার সরঞ্জাম ; সে ধোঁয়া ছাড়ার পর, ইলুসে গুঁড়ির ছিটে দিয়ে মেঘ তাকে আশিস্ জানাল। শেষে তিনিও নেমে এলেন, আর রীতিমতো এক পস্‌লাও বর্ষাল— বেশ যেন স্বাভাবিক বৃষ্টি।

শাস্ত্রে বলে সুখের পর দুঃখ চাকার মতো ঘুরপাক খায়। সৃষ্টির কত রকম জিনিস চাকা ভাবে ঘোরে, ভাবলে চমৎকার লাগে।

ধরো না কেন, নিশ্বাসের সঙ্গে জন্তুরা হাওয়া থেকে অক্সিজেন টেনে নেয়, প্রশ্বাসের সঙ্গে ছাড়ে অক্সিজেন-কার্বন-মেশানো বাষ্প। তাই থেকে গাছগুলো কার্বন খেয়ে নিয়ে পরিষ্কার অক্সিজেন হাওয়ায় ফিরে দেয়। সেজন্যে এই দুই পক্ষ পাশাপাশি বাস করলে থাকে ভালো।

আবার উদ্ভিজ্জ না খেলে পশুপাখি শরীর রাখার মসলা পায় না, তা থেকে যা দরকার নিয়ে বাদবাকি ময়লা বলে ফেলে দেয়। সেই ফেলা জিনিস দিয়ে মাটি উদ্ভিদকে সার যোগায়। আরো দেখো গ্রামবাসী শহরকে পেটের খাবার সরবরাহ করে, শহর পাড়াগাঁয়ে মনের আহার পাল্টা পাঠায়। শিষ্যকে গুরু নিজের সম্পদ দিয়ে আনন্দিত করেন, শিষ্যের আনন্দ দেখে দ্বিগুণ আনন্দে আরো দিতে থাকেন, আনন্দের এই চক্রবৃদ্ধি বাড়ে দুজনে মিলে ভূমানন্দের সন্ধান পান।

কিন্তু কিসের থেকে কোথায় এসে পড়া গেল? শিবের গান তো করতে বসা হয়নি এখানে বলবার কথাটা এই ছিল— নদীকে পুষ্ট করে বৃষ্টি, বৃষ্টিকে আনতে হলে বৈদ্যুত লাগে, আবার পুষ্ট নদীর সাহায্যে বিজলী তৈরি হতে পারে।

নদীর জল চালাচালির সময় USSR এই চক্রের কথা ভোলেননি। যেখানে, নদীর প্রপাত আছে, যেখানে লম্বা ঘোরালো বাঁকের দুই মুড়ো খাল কেটে জুড়ে দিলে জলের তোড় বাড়ানো যায়, সেই সেই জায়গায় একটা করে বিজলী-তৈরির শক্তি-ঘর তোলা হচ্ছে। এক পক্ষে যেমন নদীর জলের জাল, অন্য পক্ষে তেমনি বৈদ্যুত তারের জাল; কোথাও কখনো কম পড়লে, যেখানে বেশী—সেখান থেকে অভাব পূরণ হতে পারবে।

এবার তাহলে, আর খাল-কেটে বাঁধ বেঁধে নদীর জলকে খোশামোদ ক'রে আনা নয়। শত-হস্তীর সহস্র-ঘোড়ার শক্তি ধরে এমন সব বৈদ্যুতপম্প বসে যাবে, যারা মাত্র সুইচের ইঙ্গিত পেলে, পাহাড়ী ঝরনাকে লজ্জা দিয়ে, এখাল থেকে ওখালে, নিচের নদী থেকে উপরের হ্রদে হুড়হুড় করে জল তুলবে ফেলবে।

আরো উপরের কথা হল, আকাশ থেকে সোজাসুজি জল নামানো।

হাওয়া যতই শুখিয়ে থাক্ না কেন, তাতে বেশ একটু জলের ভাপ থেকেই যায়। যখন মানুষের সাধ্যি এমন হবে যে, অতিরিক্ত খরচ না করে যেখানে ইচ্ছে আকাশের জল টেনে নামাতে পারবে, তখন ইন্দ্রের পৌরাণিক কর্তব্য আধুনিক মানবে নিজেই সেরে নিতে পারবে। তাহলে দেবরাজ শখের নাচগান নিয়ে মশগুল থাকার সময় "গেলুম রে, মলুম রে" রবে কেও তাঁর মজলিসের রসভঙ্গ করতে দ্বারস্থ হবে না।

তবে সাবধান। অব্যবস্থিত রাজ্যে এবিদ্যে খাটাতে গেলে বিজ্ঞানী উভয় সংকটে পড়ে যেতে পারেন। যার বাড়ি বিয়ে, সে আবদার করবে আকাশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে থাক্; ওদিকে যে-চাষার খেত খাঁ খাঁ করছে সে ঝম্‌ঝমে বৃষ্টির জন্যে আপসা-আপসি করবে। মাঝে থেকে বিজ্ঞানী-বেচারীকে এক পক্ষ না এক পক্ষের ঠ্যাঙার গুঁতো না খেতে হয়।

USSR-এ সে হাঙ্গামার ভয় নেই। তাদের পঞ্চ বার্ষিক সংকল্পের খবর আগে থাকতেই সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। যেদিন না বর্ষালে কারো ক্ষতি নেই, উৎসবের পক্ষে সেই দিনই শুভদিন ধরা হবে; আকাশের কোন্ ভাগে কোন্ গ্রহতারা দেখা দিয়েছে তাতে মানুষের ভাগ্যের ওলট-পালট কল্পনা করার দরকার হবে না। মনের মিলে পরস্পরের হিতসাধনে মানুষ যে যে জায়গায় জমায়েত হয়, সেগুলিকেই পরম তীর্থ বলে মানা হবে; ভিড় ঠেলে মরতে মরতে এ-ঘাটে ও-ঘাটে ডুব দিয়ে, মন বা কপাল ফেরাবার দুরাশা মনে পোষা হবে না। যে বর্ষণে দেশশুদ্ধ লোকের অন্নসংস্থান হবে, তার জন্যে দেবতার খামখেয়ালী মর্জির অপেক্ষা থাকবে না, স্তবস্তুতির বাজে খাটুনি বেঁচে যাবে, যাদের গরজ তাদেরই প্রতিনিধি নিজগুণেই যথাযথ ব্যবস্থা করবেন—এই হচ্ছে USSR-এর সমীকরণ যজ্ঞের নববিধান।

পাতালের কথা

পাহাড় যেন জলস্থল আকাশপাতাল সবেরই বাইরে, অথচ সকলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। পাতালে ভিত, আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে মাথা, প্রকাণ্ড ভাল্লুকের মতো, পিঠে জঙ্গলের রোঁয়া নিয়ে ভুঁইয়ে হাতপা ছিতরে সে উপ্পুড় হয়ে আছে। নিজের উপর মেঘের বর্ষণ টেনে নিয়ে সেই জল সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে দিচ্ছে, সেই সঙ্গে গা-ধোয়া মাটি দিয়ে নিচের সার-চোষা মাঠগুলোকে তাজা রাখছে।

সমুদ্রকে রত্নাকর বলে বটে, কিন্তু রত্নের ভার নিয়ে কোনো ডোবা-জাহাজের ভিতর থেকে ছাড়া, সমুদ্রতলা থেকে রত্ন উদ্ধারের খবর তো শোনা যায় না। আসল রত্নাকর হল পাহাড়—তার পেটের ভিতর, ছাল-তোলা পিঠের উপর, আশপাশের খাঁজে-গর্তে যত রত্নের কাঁড়ি।

আজকাল, অবশ্য, পাঁচ-রঙা পাথর হাতে পায়ে গলায়, ফোঁড়া নাক-কানে ঝুলিয়ে "আমি কী হনু" গোছের হাবভাব দেখাবার দিন চলে যাচ্ছে। গবর্নমেণ্টের কৃপায় মুদ্রার কাজও সোনা রুপো ছেড়ে কাগজ দিয়ে সারা হচ্ছে। তবুও নানা কাজের ধাতুগুলোকে রত্নই বলতে হয়। আধুনিক হিসেবে এগুলি ভূতও (ভৌতিক পদার্থের মৌলিক উপাদান) বটে।

মাত্র পাঁচ ভূতের দিন আর নেই, বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৯২টা ভূত খুঁজে পেয়েছেন, ক্রমে আরো হয়তো পাবেন। তার মধ্যে চলতি কথায় যাকে ধাতু বলে তা তো আছেই, এমনও অনেক জিনিস আছে যাকে ধাতু বলা হয় না; তাছাড়া আছে রেডিয়াম জাতীয় পদার্থ, যাদের পরমাণু ক্রমশ তেজ হয়ে ফেটে ফেটে বেরিয়ে পড়ে, যেজন্যে তাদিকে রেডিও-তেজী (radio-active) বলা হয়।

সে-হিসেবে পাহাড়কে ভূতালয় বলাও চলে। শোনা যায় পাহাড়ী জাতদের বড্ড ভূতের ভয়—কিন্তু সে-ভূত এ-ভূত নয়।

কখনো কখনো রত্নের খনি দৈবাৎ ধরা পড়ে। রুশের উরল-পাহাড়ে একবার একটা বড়ো গাছ ঝড়ে উপড়ে পড়ে। পাহাড়ী চাষারা তার শিকড়-জড়ানো দুএকটি পান্নার পাথর পেয়ে, শিকড়ের গর্তের মধ্যে আরো খুঁড়তে খুঁড়তে পান্নার খনিতে পৌঁছে গেল। মার্কিন দেশে এক ডোবার উপর তেল ভাসছে দেখে নল চালিয়ে পাথর-তেলের উৎস বেরিয়ে পড়ল। আমাদের দেশেও পাহাড়ের গায়ে রাস্তা করতে বা পাথর কাটতে মাঝে মাঝে নানান ধাতুর সন্ধান মেলে।

কিন্তু দৈবের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে আবিষ্কারের কাজ কচ্ছপের চালে চলে, বিজ্ঞানকে সহায় করলে খরগোশের মতো দৌড়তে পারে। টাকার ব্যাগ হারিয়ে এলে তাকে হঠাৎ কোথাও কুড়িয়ে পাওয়ার আশা খুব কম, বিধিমতে খুঁজতে গেলে ভাবতে হয়, কোথায় যাওয়া হয়েছিল, কোন্ পথে আসা হয়েছিল, কার গাড়িতে চড়া হয়েছিল, মাটির পানে চোখ রেখে সেই পথে ফিরে গিয়ে, সেই গাড়োয়ানের খবর করে তন্নতন্ন করে দেখতে হয়। খনি খোঁজারও সেই নিয়ম।

ফিন-জাতের দেশ ফিন্‌ল্যাণ্ড-এ এক বিজ্ঞানী কতকগুলো বড়ো বড়ো তামার পাথর দেখতে পান। সেটা পাহাড়ী জায়গা নয় যে, তামার খনি থাকবে। তাহলে সে পাথর এল কী ক'রে। আকাশ থেকে নিশ্চয়ই পড়েনি; তবে জলের তোড়ের সঙ্গে গড়িয়ে আসা অসম্ভব নয়।

কিন্তু নদী কই।

এখন না থাক্, এক সময় ছিল, ছড়ানো নুড়ি দেখে অনুমান হয়।

কেন।

তবে গোড়া থেকে বলি শোনো।

উঁচু পাহাড়ের, কিম্বা মেরুর কাছাকাছি দেশের পাহাড়ের মাথা এত ঠাণ্ডা যে, সেখানকার বরফ মোটেই গলতে পায় না, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বরফী-ধারা (glacier) হয়ে পৃথিবীর টানে আস্তে আস্তে নামতে থাকে।

মনে করো এক চাংড়া বরফ এক-ফেরা সরু তার দিয়ে ঝোলানো আছে। চাংড়াটার ভারে নিচের তারের ঠিক উপরের এক লাইন বরফ গলে যাবে, সেই ফাঁকে তারটা বরফের ভিতর কেটে ঢুকবে। যেমন ঢোকা, তারের নিচে আর চাপ থাকবে না, গলা জলটুকু আবার বরফ হওয়ায় ফাঁকটা বুজে যাবে। এমনি করে তারটা ধীরে ধীরে বরফের ভিতর দিয়ে কাটার চিহ্ন না রেখেই উঠবে। শেষে তারটা একেবারে উঠে গেলে চাংড়াটা দুটুকরো না হয়ে আস্তই তার ছেড়ে নিচে পড়বে।

পাহাড়ের খোঁদলের মধ্যে বরফীনদী সেই ভাবেই চলে। দুই কিনারার চাপে ধারে ধারে একটু করে একবার গলে, গলার সময় একটু নামে, চাপ উতরে গেলে সে জায়গা আবার জমে যায়, আবার চাপ পড়ে। এই গলা জমা ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে, বাইরে থেকে দেখলে সমস্তটা নিরেটভাবেই ক্রমে নিচের দিকে নামে।

ছোটো বড়ো ঢিলে পাথর পথে যা পায় তাই আঁকড়ে বরফীনদী সঙ্গে নিয়ে চলে, সেগুলো তলায় কিনারায় আঁচড়ের দাগ রেখে যায়। নিচের গরমে পৌঁছে নদীর বরফ গলে জল হলে পর, বড়ো পাথরগুলো সেখানেই থেকে যায়, ছোটোগুলো জলের তোড়ে কিছু দূর ঘসড়াতে ঘসড়াতে গোল হয়ে যায়। শেষে জমির ঢাল কমে গেলে স্রোতও মন্দ হয়ে যায়, তখন নদী বালি মাটির কণার চেয়ে ভারি আর কিছু টেনে নিতে পারে না, তখন নুড়িগুলোকেও ফেলে যায়।

এই বৃত্তান্ত মনে থাকায়, যে-বিজ্ঞানী সেই তামার পাথর দেখেছিলেন

তিনি নুড়ি দেখে, আশপাশের পাথরের গায়ে আঁচড়ের দাগ দেখে সেই পুরাকালের বরফীনদীর পথ ধরে চলতে লাগলেন, ৪০।৫০ মাইল যেতে না যেতেই পাহাড়ী জমির মধ্যে তামার খনি পেয়েও গেলেন।

তবু থাকে একটা সমস্যা। এক সময় যেখানে বরফীনদী ছিল, আজ সেখানে মানুষের বসবাস,—এমনটা হয় কী করে।

এ নদী হচ্ছে সেই কল্পের যখন পৃথিবীর উত্তর ভাগের সবটাই মেরুর মতো বরফের রাজ্য ছিল। ক্রমে ভৌতিক ক্রিয়ার গতিকে বরফী যুগ কেটে গিয়ে য়ুরোপ-এসিয়ার উপর ভাগ মানুষ থাকার উপযোগী হল। যদি কালে ভূখণ্ডের নড়াচড়ার গতিকে সমুদ্রের মধ্যে গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম্‌ নামের গরম জলের যে ধারা চলাচল করছে তার স্রোত অন্য দিকে ঘুরে যায়, তখন ইংল্যাণ্ড আইস্‌ল্যাণ্ড হয়ে যাবে,—কিন্তু তখনো কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জমাট বেঁধে থাকবে।

পাহাড়ের উপরকার কোনো পাথরের গায়ে হাত দিলে সেটা সেখানকার হাওয়ার মতোই ঠাণ্ডা ঠেকবে। কিন্তু পাহাড়ের ভিতরটা বিলক্ষণ গরম। রেললাইন চালাবার জন্যে যখন সুরঙ্গ কাটে, পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছে এত তাত বাড়ে যে কাজ করাই মুশকিল। মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে চললে সেখানেও গরম, যত তলানো যায় তত তাপ। শীত দেশেরও গভীর খনিতে যারা কাজ করে তারা গায়ে জামা রাখতে পারে না। মার্কিন দেশে একটা পাথর-তেল তোলার নল দুমাইল নিচে পর্যন্ত নামানো হয়েছে, তার তলায় জল আপনি স্টীম হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন ১৫।২০ মাইল নিচে পাথর-গলা তাত।

মোট কথা, আমরা যে ভূমির উপর বাস করি, বড়ো বড়ো ইমারত তুলি, যাকে স্থাবরের আদর্শ বলে মানি, সেটা গলা ধাতুর উপর ভাসছে বললেও হয়। ২০।২৫ মাইল নিচে যা কিছু আছে—শোনা, রুপো,

লোহা, সীসে, টিন—সবি গলা অবস্থায়, তবে উপরকার ভীষণ চাপের কারণে টগবগ করে না ফুটলেও তাতে তরলতার কিছু কিছু গুণ আছে।

বিজ্ঞানীরা এই পাঁচ মিশল গলা পদার্থটাকে magma বলেন, উপরে উঠে ঠাণ্ডা হলে এর থেকে যত রকম ধাতু পাথরের ও অবশেষে মৃত্তিকারও জন্ম হয়, সে খাতিরে আমরা একে মাতৃকা বলতে পারি।

এই মাতৃকার তলায় কোন্ প্রচণ্ড চুলোয় আগুন জ্বলছে?

তলায় চুলোই নেই। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, আরো ৫০।৬০ মাইল নিচে গেলে যত চাপ বাড়ে তত তাপ বাড়ে না। উত্তাপের কারণ মাতৃকার মধ্যেই আছে—এক ঝাঁক সেই রেডিও-তেজী ধাতুর পরমাণু, যারা ক্রমান্বয় ফেটে ফেটে বেরচ্ছে, তারাই এই ভীষণ আঁচ জাগিয়ে রাখে। এদেরই কল্যাণে পৃথিবী চাঁদের মতো জুড়িয়ে গিয়ে প্রাণী-পোষার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েনি।

গড়ে ২০ মাইল নিচে এই রেডিও-তেজী ধাতুর ভারি ভিড়। আরো ৬০ মাইল নেমে গেলে এগুলির চিহ্ন বড়ো একটা পাওয়া যায় না, সেখানকার চাপে পাথর তরল হতে পায় না। সুতরাং ৬০ মাইল গভীর মাতৃকা সাগরের শক্ত পাথরের তলা আমাদের পায়ের ৮০ মাইল নিচে। পৃথিবীর ব্যাসের মাপ ৮০০০ মাইল, কাজেই কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ ৪০০০ মাইল তফাত। এই ৪০০০ মাইলের উপরকার ৮০ মাইল স্তরের এইটুকু খবর পাওয়া গেছে।

জলের সমুদ্রে যেমন জাহাজ, তেমনি পৃথিবীর উপরের স্তরটা, ডাঙাই হোক, পাহাড়ই হোক, আর সাগরজলে ভরা খাদই হোক, সবই সেই মাতৃকার উপর দোলা খাচ্ছে; তবে দোলের তালটা খুব বিলম্বিত। ডাঙার তলার পাথরের ভিতটা যত ভারি, সমুদ্রের তলার ভিতটা তত

নয়, সবচেয়ে ভার পাহাড়শ্রেণীর তলার। ভার অনুসারে এসব মাতৃকার মধ্যে কম-বেশি ডুবে আছে।

কিন্তু উপরের ওজন বরাবর এক রকম থাকে না। জলের ক্রিয়ায় পাহাড়ের উপরকার স্তর দিন-কে-দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে, তার গা থেকে খসা মাটিপাথর, আরো পথে কুড়ানো যা-কিছু নিয়ে নদীগুলো অবিশ্রান্ত সমুদ্রে ঢেলে চলেছে। তার ফলে পাহাড়গুলো হয়ে যাচ্ছে হালকা, নদীর মোহানার সামনেটা হয়ে আসছে ভারি। সেজন্যে, ধীরে ধীরে হলেও, পৃথিবীর ভিন্ন অংশের ওঠা নামা চলছেই। যেমন, যে নৌকোটায় যাত্রী ওঠে সেটা জলের ভিতর একটু নেমে যায়, যার থেকে যাত্রী নামে সেটা একটু ভেসে ওঠে। তাছাড়া তাপেরও হেরফের চলতে থাকে।

পাত্রে ভরা জলের উপর চাপ দিলে উপচে পড়ে, ঢাকা থাকলে ফাঁক দিয়ে ছিটকে বেরোয়। জলভরা হুঁকোয় টান না দিয়ে ফুঁ দিলে জল নল দিয়ে ফোয়ারা হয়ে ওঠে। সেইরকম, কোনো ভূখণ্ডের ভার কিম্বা তলার তাত বেড়ে উঠলে, তার মাতৃকার উপর চাপ পড়ে, তাতেগলা ধাতুগুলো এপাশ ওপাশ সরার জায়গা না পেয়ে উপরের পাথরের ফাটলের মধ্যে দিয়ে উঠে পড়ে, শেষ পর্যন্ত ফাঁক পেলে ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে পড়ে। দুপাশের পাথর কম মজবুত হলে সেগুলোকে সুদ্ধ তুলে পাহাড় করে দেয়।

এরকম ঠেলে-ওঠা জায়গার মধ্যে বিস্তর ফাটল থেকে যায়, তাই পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই বেশির ভাগ মাতৃকা উপরে বেরিয়ে পড়ে, সেখানে ঠাণ্ডা হলে পাথর হয়ে জমে যায়। ফাটলের ভিতরে ও উপরে হালকা, নিচে ভারি স্তরে স্তরে থিতিয়ে থাকে। তাতেই জন্মায় এক এক স্তরে এক এক রকম পাথরের খনি।

ফাটলে ওঠার সময় মাতৃকা কোনো গুহার জমা জলে ঠেকলে, তার

তাতে সে জল স্টীমের ফোয়ারা হয়ে মাটির ফাঁক ফুঁড়ে বেরয়, কিম্বা ধাতুগোলা গরম জলের উৎস হয়ে দেখা দেয়।

যদি গোড়ার চাপের জোর খুব বেশি হয়, যাতে ফাটলের উপরকার মুখ আরো ফাঁক হয়ে মাতৃকার স্রোত তোড়ে উথলে ওঠে, তাহলে সেরকম ফাটা-মুখ পাহাড়কে বলে আগ্নেয়গিরি।

বেরবার মুখ যদি ছোটো হয় বা মোটেই না থাকে, তাহলে চাপের মধ্যে ঠাণ্ডা হলে তরল ধাতুগুলো ফটিকের মতো দানা বেঁধে ধনীর পছন্দসই পাঁচ রকম মণি হয়।

এই হল এক ধরনের খনির জন্মবৃত্তান্ত। এ কাহিনীর পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে ভূখণ্ডগুলোর নড়াচড়ার সময়, ভূমি কেঁপে কেঁপে উঠে মানুষের তৈরী ঘরবাড়ি, কখনো বা মানুষের প্রাণসমেত, নষ্ট করে। ভূতের এই উপদ্রবকে মানুষের পাপে দেবতার কোপ বলে কেউ কেউ ব্যাখ্যা দেন। জনকয়েকের অপরাধে স্থানবিশেষের আবালবৃদ্ধবনিতাকে সাজা দেওয়ার রোগ মানুষের নেতাদের মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু এরকম অদ্ভুত বিচারনীতি দেবচরিত্রে আরোপ করায় তাঁদের মহিমা কতদূর বাড়ানো হয়, সে বিচারের ভার শ্রোতার উপর রইল।

ধাতুপাথর ছাড়া অপর পদার্থের খনি জন্মাবার ধারা অন্যরকমের।

মাতৃকায় ভাসা দেশগুলোর ওঠানামার গতিকে কোনো ডাঙা যায় সাগরতলায় নেবে, কোনো সাগর আসে ডাঙার উপর চড়ে, যে ডাঙা তলিয়ে যায়, তার উপর সমুদ্রের অগুনতি শামুক-ঝিনুক-জাতীয় প্রাণীরা মরার সময় তাদের চুনের খোলস, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী সমুদ্রের তলার উপরে ফেলতে থাকে। এভাবে কয়েক যুগ কেটে গেলে পর, যখন সে সাগরের জল আবার সরে পড়ার পালা পড়ে, তখন তার সেই তলা আবার হয় ডাঙা, কিন্তু আগেকার সে

ডাঙা নয়, এবার চুনের পুরু পর্দা প'ড়ে তার খালদাঁড়া সব একাকার।

সাগরের যেখানে কোল ছিল সেখানে পড়ে নুনের পলি।

সাগরে বা হ্রদে নদীর মোহানা থাকায় গুচ্ছের শেওলা গজিয়েছিল, দুধারের পেঁকো মাটিতে ভারি জঙ্গল উঠেছিল। সেসব জায়গা তলিয়ে যাবার পর তাতে গাছের সংগ্রহকরা সূর্যের তেজ ভরা কয়লা, পাথর তেল জন্মায়।

এরকম নতুন-ওঠা ডাঙাগুলো বালি মাটি চাপা পড়লে এই পদার্থ-গুলো যে যার খনির মধ্যে থেকে যায়।

এখন কথা হচ্ছে, উপর থেকে কেমন করে জানা যাবে, পাহাড়ের ভিতর কোন্‌খানে ফাটল ছিল, কোন্‌টার মধ্যে কী কী পাথরইবা জমা হয়ে রয়েছে। আন্দাজে এখানে ওখানে গর্ত করে খুজে বেড়াতে গেলে বিস্তর খরচ। শক্ত পাহাড়ী পাথর কুরতে হীরে-বসানো যন্ত্র লাগে। সে খরচ বাঁচাতে হলে বিজ্ঞানীকে মগজ খাটিয়ে যন্ত্র বার করতে হয়।

এক যন্ত্র উদ্ভাবন হয়েছে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ধরে— যে আকর্ষণ থাকায় আমরা ঘরের দেয়ালে বেড়াতে পারিনে, থাকতে হয় মেঝের উপর। শুধু পৃথিবী সকলকে টানছে তা নয়, প্রত্যেক জিনিস প্রত্যেককে টানছে, তবে ছোটো ছোটো টানের ফল সাদা চোখে ধরা যায় না। সূক্ষ্ম নিক্তির মতো এই যে যন্ত্র, এটা টানের অল্প হেরফেরে সাড়া দেয়, মাটির নিচে কোনো ভারি পাথরের স্তর থাকলে সেদিকে তার কাঁটা হেলে পড়ে। এই যন্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ালে কাঁটার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় কোন্‌ জায়গার তলায় ধাতু পাথর জমা আছে।

লোহার মতো চুম্বক-টানা ধাতুর খবর কম্পাসের কাঁটাও দিতে পারে। উপর-নিচে দুলতে পারে এ ভাবে চুম্বক-কাঁটাটাকে ঝোলালে,

সে মাটির নিচে এ জাতীয় পাথর যেখানে আছে সেদিকে ঝোঁকে— তার ঝোঁকার রোখে লাইন টানলে সে লাইন ধাতুর সন্ধান বাৎলে দেবে। দু তিন জায়গা থেকে এ রকম লাইন টানলে তারা যেখানে মিলবে সেখানে পাথরও মিলবে। এ লাইনের উলটো দিকে থাকতে পারে নুন বা চুন বা কয়লার খনি।

ভূমিকম্পের মতো শত্রুপক্ষের কাছ থেকেও এ বিষয়ে সহায়তা পাওয়া যায়। ভূকম্প মাপার সিসমগ্রাফ (seismograph) নামে এক রকম কম্পমান যন্ত্র আছে, সে ভূমির কাঁপুনির রকম অনুসারে কাগজে আঁকজোঁক কাটে। তার লিখন যে পড়তে জানে, সে কাগজে-আঁকা রেখার খেলা দেখে বুঝতে পারে কোন্ দিকে কত দূরে কাঁপুনি শুরু হয়েছিল, কোন্ পথ দিয়েই বা সেটা ঘুরে ফিরে কম্পমান যন্ত্রে পৌঁছেছে।

মেঘ ডাকার আওয়াজের কথা ভাবলে এ যন্ত্রের ক্রিয়া বোঝার কতক সুবিধে হতে পারে। দুপাশ থেকে দামী-দামিনীর দল যখন বজ্র-নিনাদে মাঝের বায়ুস্তর ফুঁড়ে এসে মেলে, তখন কাছাকাছি শ্রোতার কানে প্রথমে তার কড়াৎ শব্দ বাজে। তার পরে আসতে থাকে তার প্রতিধ্বনি—গুড় গুড় গুড় গুড় গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম। প্রথম গুড়-গুড়-গুলো হল কাছের মেঘ, মাঝের মেঘ, ক্রমশ দূরের মেঘ থেকে সেই গোড়ার কড়াৎ-টা পর পর ঠিকরে আসার শব্দ। যখন এমন হয় যে দূরের মেঘ থেকে, আর কাছের এ-মেঘ ও-মেঘ সে-মেঘ ঘুরে, দুই আওয়াজ একসঙ্গে কানে পৌঁছয়, সেবারে হয় গুড়ুম; যে-বারে এক সঙ্গে তিন চার দিক থেকে আওয়াজ এসে পড়ে, সেবার হয় জানলা-দরজা-কাঁপানো বড়ো গুড়ুম; তার পরে সেই গুড়ুমের আওয়াজ এদিক-ওদিক থেকে ঠিকরে ছোটো ছোটো গুড়মে অবসান হয়।

সমজদার হয়তো এ সব আওয়াজ শুনে, আকাশে কিভাবে মেঘের চাপগুলো সেজে আছে তার একটা ছবি পেতে পারে।

একই ভূধাক্কার কাঁপুনি সেই রকম দফে দফে আসে,—যন্ত্রে প্রথম পাওয়া যায় যেগুলি সোজাসুজি সব চেয়ে ছোটো পথে এসেছে; পরে আসে যেগুলি পৃথিবী ঘুরে উল্‌টো দিক থেকে পৌছয়; শেষে হাজির হয় যেগুলি প্রথম একপত্তন নিচের দিকে তলিয়ে গিয়ে পরে পাতালের কোনো পাথরে ঠেকে ঠিকরে উপরে ফিরে আসে। শেষের এই কাঁপুনিগুলি পাতালের অনেক খবর এনে দেয়।

তবে কি তলার অবস্থা জানতে হলে ভূমিকম্পের আসার আশে হাঁ করে বসে থাকা লাগবে।

তা কেন। মাটিতে গর্ত করে তার ভিতর বারুদ বা ডাইনামাইট ফাটালে তো ভূমিকে যখন ইচ্ছে যত ইচ্ছে কাঁপিয়ে তোলা যায়। বারুদ ফাটিয়ে লাগাও যন্ত্র, ওস্তাদের কাছে ধরে দাও তার লেখা, সে বলে দেবে মাটির নিচে কোথায় কত দূরে কী রকম ধরনের পাথর আছে।

আবার আমাদের ধুয়োয় এসে পড়া গেল। বৈজ্ঞানিক বিদ্যে তো USSR-এর এক-চেটে নয়, তবে কেন এমনভাবে কথা হচ্ছে যেন এ বিষয়ে তাদের কিছু বিশেষত্ব আছে।

চলতি তন্ত্রে রাজা-প্রজা ধনী বিজ্ঞানী সবাই কাজ করে নিজের নিজের লাভের আশায়। জমির মালিক প্রায়ই বিলাসী, বিজ্ঞান সম্বন্ধে উদাসীন, অপরকে খাটিয়ে নিতে মজবুত, পারিশ্রমিক দেবার বেলায় কষা। বিজ্ঞানীও নিজের বহু কষ্টে পাওয়া বিদ্যের ন্যায্য মূল্য না পেলে তাকে ছাড়তে চান না, পেটেই রেখে দেন। যাঁরা নির্লোভের বড়াই করেন, আমাদের সেই তাপস ফকিররাও ওষুধবিষুধ পেলে যে রকম

আগলে রাখেন, একা বিজ্ঞানীর উপরই বা কটাক্ষ করা কেন। এই লাভ বা প্রতিপত্তির মোহে কত ভালো ভালো আবিষ্কার সাধারণের চির-সম্পত্তি হতে পায়নি তার কি ঠিক আছে।

বিপ্লবের আগে থেকেই রুশের কর্স্ক (Kursk) জেলার লোকের নজরে ঠেকত যে, সেখানকার সব কম্পাসের কাঁটা নিচের দিকে একটু ঝুঁকে থাকে। এর কারণ বার করার জন্যে লীষ্ট (Leist) নামে এক জর্মান পণ্ডিতকে সকলে ধরে পড়ল। সে বিজ্ঞান-পাগল এ কাজে লেগে গেল তো বারো বৎসর টানা খেটেই চলল।

তার হাতে ক্রমশ ৪৫০০ দাগের এক জটিল নকশা গড়ে উঠল, যার এক এক দাগ ফেলতে তাকে চৌপর দিন ধুলোয় জঙ্গলে হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে, কারণ দাগ বেঠিক পড়লে তাতে অকাজ ছাড়া কোনো ফল হবে না। যারা কম্পাস বয় তাদের কোটে লোহার বোতাম বা পকেটে চাবির গোছা, বা কাছাকাছি লোহার যন্ত্রপাতি থাকতে কম্পাসের কাঁটার লাইনে দাগ কাটলে ভুল হবে।

হাড়ভাঙা খাটুনির পর তো নকশা দাঁড়াল। বাকি রইল পাঁচ জায়গায় গর্ত করে নকশার লিখন ক্ষেত্রে যাচানো।—কিন্তু তার টাকা আসে কোত্থেকে।

খনি বেরলে তো জমিদারদের লাভ। কিন্তু নকশা এত বড়ো জায়গা দেখাচ্ছে, যা অনেক জমিদারের এলাকায় চারিয়ে পড়ে। অথচ মিলে-মিশে কাজ করার অভ্যেস জমিদারদের আদবেই নেই, বিজ্ঞানের তাঁরা কোনো ধার ধারেন না; এক মুদ্রা বার করলে সেটা হাল-ফিল দু মুদ্রা হয়ে ফেরা চাই, এই এক তত্ত্ব তাঁরা নিশ্চয় জানেন।

কাজেই অনেক কষ্টে যদি বা পরীক্ষার জন্যে তাঁরা চাঁদার টাকা কবলালেন, তো মেওয়া ফলার সবুর তাঁদের সইল না, কাজ শেষ হবার

আগেই চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। হতাশ পণ্ডিত তো পাত্তাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে না খেতে পেয়ে মারা গেল। তখন সেই নকশা পড়ল জর্মান বিশেষজ্ঞদের হাতে। সেটা যে কত বড়ো গুপ্ত ধনের সিন্দুকের চাবি, সে কথা তাঁদের বুঝতে বাকি রইল না।

ইতিমধ্যে রুশের বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে। জমিদার আর নেই, রাষ্ট্র চালাচ্ছেন USSR। ঐ নকশার মূল্য লাখে লাখে আদায় করার আশায় সেই জর্মান বিশেষজ্ঞের দল রুশে চলে এলেন।

কিন্তু USSR নিজের গুপ্ত-সিন্দুকের চাবি পরের কাছে ঠকে কিনবেন কেন,—তাঁরা কি চাবি গড়তে জানেন না। এক পণ্ডিতের জায়গায় তাঁরা লাগিয়ে দিলেন এক ঝাঁক বিজ্ঞানী ; দেখতে দেখতে বেরিয়ে পড়ল কোটি কোটি মন লোহায় ভরা এক প্রকাণ্ড খনি। তাতে USSR-এর এক মস্ত অভাব মিটে গেল, কারণ বাইরের রাজ্য সকলেই বিরুদ্ধ-পক্ষ, তাদের কাছ থেকে ডবল দাম দিয়ে লোহা কিনতে হচ্ছিল।

এসব ব্যাপারের মজাটুকু এই যে, ভারতের ঋষিদের বাণী দূরে থাক্, USSR তাঁদের নামও শোনেননি, অথচ কাজে তাঁদের কথার ব্যাখ্যা অজানতে করে চলেছেন। উপনিষদে ত্যাগ করে ভোগ করার কথা যা বলা হয়েছে, বিষয়ীর কাছে তার কোনো মানেই হতে চায় না, বড়ো জোর তাদিকে এইটুকু বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে ব্যাঙ্কে টাকা তোলা থাকলে ভোগে আসে না, খরচ করলে তবেই সেটা মূলধন হয়ে ভোগের উপায় জন্মাতে পারে। ওদিকে যাঁরা বৈরাগ্য-রোগ-গ্রস্ত, তাঁরা ভুলে যান যে আনন্দসম্ভোগের আসল উপায় শিখিয়ে দেওয়াই ঋষির উদ্দেশ্য, মনে করেন বুঝি ত্যাগের গুণগানই করা হচ্ছে।

USSR কিন্তু ঠিক বুঝেছেন, কাজেও দেখাচ্ছেন যে, যা ত্যাগ করা দরকার সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ভোগের মোহ, যাতে একের লোকসান

বিনা আরের লাভ হয় না, যেজন্যে বিষয়ে বিষ মাখানোই থাকে, তাই নড়তে চড়তে লাগে ঝগড়াঝাঁটি, মানুষের উন্নতির দরজা থাকে বন্ধ। এই মোহের হাত থেকে উদ্ধার পেলে তবেই সম্ভব হয় দেশসুদ্ধ লোকের সম্ভোগ, যাতে ভোগ্যবস্তু সকলের ভাগেই বেড়ে ওঠে, সমবেত ব্যবস্থার গুণে বিবাদের জড় মরে যায়, মনকে উঁচু স্তরে ওঠানোর পথ খোলসা হয়।

তৃতীয় পালা

মনপ্রাণের উৎকর্ষ

আহারের সমস্যা

সাধে ভাবি USSR হয়তো এবারকার অবতার, দেখাই তো গেল, আকাশ বায়ু জ্যোতি জল এঁদের বাগ মেনে আসছে, এঁদের শাসনে উত্তরবাহিনী নদী পশ্চিমে চলেছে, পশ্চিমের নদী পুবের নদীর সঙ্গে জল মেশাচ্ছে ; এঁদের বিধানে যেখানে ছিল মরু সেখানে কোথাও বনের পাখির বৈঠক বসেছে, কোথাও শহুরে মানুষ হট্টগোল লাগিয়েছে ; যা ছিল ফাঁকা পাথুরে অধিত্যকা, হয়েছে সেখানে কাটা খাল, খালের ধারে সবুজ গাছের বেড়া, সেকেলে নবাবদের কেয়ারি-করা বাগানের অতি বৃহৎ সংস্করণের মতো ; সকলের আধার যে পৃথিবী তার রূপ এমন ফিরে যাচ্ছে যে কিছু কাল পর এরোপ্লেন থেকে এক নজর দেখলে তাকে সেই ইহলোক বলে আর চেনাই যাবে না।

ধরিত্রীকে রূপসী করার শখ তো নয়, "দরিদ্র নারায়ণ" যাতে পেট ভরে খেতে পান, সেই আগ্রহে এত গা-ঘামানো, এত মাথাব্যথা।

তাহলে আমরা নরেরা কি রাক্ষসের জাত—বুঝি শুধু আঁউ মাউ আর খাঁউ।

তা যাই বল, এক পেট খিদে নিয়ে বুদ্ধির কি ধার হয়, না মেজাজ খোস থাকে। চরম গতির কথা তো ছেড়েই দাও।

এই চোদ্দ-পোয়া ধড়টাকে তাজা ভাবে খাড়া না রাখলে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কোনোটারই নাগাল মেলে না। আর মানুষের খাবার ধাঁচাটা যদি রাক্ষুসে হয়েই থাকে, সে দোষও প্রকৃতি-মায়ের, যাঁর কৃপায় কোনো

না কোনো প্রাণী হত্যা না করলে তার প্রাণই বাঁচে না। কাজেই খোদার উপর খোদকারি ক'রে প্রকৃতির প্রকৃতি বদলাতে না পারলে মানুষের মানুষ হওয়াই দায়।

মহাভারতে দুরকম রাক্ষসের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্বর-অবস্থায় মানুষের হিড়িম্ব-রাক্ষসের মতো ভাব—যাকে পাই তাকে খাই, জুটলে নাচি গাই, নইলে হন্যে হয়ে বেড়াই। সভ্যতার বড়াই করলেই তো হয় না, আজ পর্যন্ত অনেক জাতের মানুষের জীবনযাত্রা ঐ রকমই। কিন্তু বকরাক্ষসের মতি অন্য ধরনের। সে পরের আমন্ত্রণ থেকে বাঁচিয়ে গ্রামকে স্বচ্ছন্দে রাখত, তার দাম হিসেবে নিজের পেটচালাবার জন্যে পালা করে একজন গ্রামবাসী খেত।

উৎকৃষ্ট মানুষ বকের নিয়মে আশ্রিত প্রাণীদের সঙ্গে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু অনেক সময় সে ঐ রাক্ষসের মতো মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না। দেখো না কেন, আমাদের ধর্মপ্রাণ জাতের মধ্যে নিজের পাঁঠা খাবার শখটা দেবতার উপর চাপিয়ে একদল ভক্ত রক্তনদী বইয়ে উৎকট আমোদে মাতে। সভ্যতা-অভিমানী মার্কিন দেশে জানোয়ার-মারা কলে এক দিকে দিয়ে শুয়োর ঢুকিয়ে জন্তুটার আর্তনাদের রেশ কান থেকে না যেতেই অন্য দিক দিয়ে তার চামড়ার জুতো বার করে নিজের কেরামতি দেখে নিজেই তাক।

সে যাই হোক, নরোত্তম পদ পেলে কী হবে বলা যায় না, নরের এখনকার অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে রফারফি ছাড়া গতি নেই। বাঁদর মাংসাশী নয়, সে পাতা ফল খেয়ে থাকে। কিন্তু অভিব্যক্তির তাড়ায় যখন বানরের এক দল গাছ থেকে নেমে দুপায়ে খাড়া হয়ে নর-রূপ নিল, তখন পড়ল ফাঁপরে। ফল থেকে এসে গেল দূরে, অথচ চাষবাস

তখনো শেখেনি। খিধের জ্বালায় কী করে, পাথরের অস্ত্র বানিয়ে তা দিয়ে জীবজন্তু মেরে খাওয়া অভ্যেস করতে হল।

কিন্তু মাংস খাওয়া নরের দেহমনের উপযোগী না হওয়ায় মানুষের শরীর হয়ে দাঁড়াল ব্যাধিমন্দির। সে বিষয়ে সচেতন হয়ে আজকালকার পাশ্চাত্য ডাক্তারেও বলতে আরম্ভ করেছেন যে, মাংস খাওয়া মানুষের পক্ষে দরকারী তো নয়ই, উপকারীও নয়। কৃষ্টির ফ'লে বুদ্ধিবৃত্তি শোধন হলে মানুষ রাক্ষস-পিশাচের নকল না করে, নিজের আক্কেল মতো চলে রক্তারক্তি কাণ্ড ত্যাগ করবে—এই আশায় ভর করে এখানে নিরামিষ আহারের আলোচনাই চলুক।

গাছের সঙ্গে মানুষের যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ সেটা নেহাত মন্দ দাঁড়ায় নি। ফলের বেলায় তো কথাই নেই, ওটা গাছ নিজের গরজে মিষ্টি রসের ভেট সমেত মানুষের হাতে তুলে দেয়, সঙ্গে থাকে এই মাত্র আবদার— "বংশ রক্ষার উপায় করে দিয়ো।"

ফল ফলাতেই তো গাছতলার আশপাশের মাটির সার ফুরিয়ে আসে, সেই মাটিতে সোজাসুজি বীজ পড়তে দিলে নতুন চারার সঙ্গে পুরোনো গাছের খোরাক নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যাবে। তাই দূরের তাজা মাটি পর্যন্ত বীজ পৌঁছে দেবার জন্যে সচল জীবের সাহায্য নইলে নয়।

এদিকে, গাছের সে নীরব আবেদন মানুষ নিজের গরজেই মঞ্জুর করে, গাছের মাথায় হাত বুলিয়ে মিষ্টান্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেছে। তাই দেশে দেশে মানুষের যত্নে-করা যত্নে-রাখা ফলবাগানের ছড়াছড়ি। কিন্তু হায়রে কানা পদ্মলোচন। সুফলা বাংলার ফলবাগান কোথায়।

যাই হোক, প্রকৃতির ব্যবস্থার মধ্যে মানুষে-গাছে ফলসংক্রান্ত

চুক্তিটা সমবায়সম্বন্ধের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত— কোনো পক্ষের লোকসান নেই—উভয়েরই লাভ।

চোরের উপর বাটপাড়ি করে উদ্ভিদ-খেকো জন্তু মেরে খাওয়া বাদ দিলেও দুধ ডিম খাওয়া, রোঁয়া-পালক পরা, আরো পাঁচ কাজ আদায়ের কারণে পশুপাখির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ রাখতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে গোরুর পালের চাকচিক্য দেখলে চোখ জুড়োয়, মানুষের যত্নচেষ্টায় তাদের দেহ বংশ দুই বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না; স্বীকার করতে হয়, সেখানে দুধ দিয়ে গোজতি যথেষ্ট প্রতিদান পাচ্ছে। কিন্তু পূজিত গো-মাতার দেশে তার ক্ষীণ খর্ব দেহ, তার বাছুরের হাড়-সার দশা দেখলে দরদীর দুধ খাবার রুচি উড়ে যায়। পুরো খেতে না দিয়ে অতিরিক্ত খাটিয়ে আধমরা করে রাখার যে-অহিংসা, তার চর্চা না করে বরং ওরকম ভবযন্ত্রণা থেকে সংক্ষেপে নিষ্কৃতি দেওয়াটা বেশি দয়াধর্মের পরিচয় কিনা, সে প্রশ্ন ওঠে; কিন্তু এখানে তার বিচার নাইবা করা গেল।

তার চেয়ে ঘাসের দিকে চোখ ফেরানো যাক। বুনো অবস্থায় ঘাসের বিচি হবার পরেও বটে আগেও বটে, বনের জন্তুরা খেয়ে মাড়িয়ে তার কর্ম-সারার যোগাড় করে। তা সত্ত্বেও যে-বিচিগুলো পেকে উঠতে পায় তাও কতক পাথুরে জমিতে পড়ে শুখোয়, কতক জলে পচে, কতক নানা বিপাকে মারা পড়ে; শেষে হাজার-করা দুচারটে যা সুবিধেমতো জায়গায় আস্ত পৌঁছয়, তারাই ঘাসবংশ বজায় রাখে।

এর তুলনায় ঘাসের শস্য-দাদার আরামের কথা ভাবো। কত খাটুনি দিয়ে তৈরি, কত আগাছা নিড়িয়ে পশুপাখি খেদিয়ে সাবধানে রাখা জমিতে বীজ লাগানো হয়, বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কত রকমের তদ্বির চলতে থাকে। শেষে খেতের উপর খেত জুড়ে নধর সবুজের বাহার দেখে,

চাষা তো চাষা, কবির মনেও আনন্দ ধরে না। কে বলবে মানুষে-শস্যে নিন্দের সম্পর্ক।

অনেক স্থলে গাছ দিগ্বিজয় করারও সুযোগ পেয়েছে। মানুষ কত হাজার বৎসর ধরে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রকম কারণে এক এক দলকে দেশান্তরে যেতে হয়েছে—আজ বলে নয়, আদিকাল থেকে; শুধু কাছাকাছি নয়, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে, নানা জাতের মানুষের যাতায়াতের চিহ্ন আছে,— কখনো আবহাওয়ার হেরফেরে, কখনো বা মানুষের প্রধান শত্রু মানুষের তাড়া খেয়ে। যারা যখন যেখানে গেছে সঙ্গে নিয়েছে খাবার ফলমূল দানা, তার মধ্যে পথে কিছু পড়ে গিয়ে মাটিতে লেগে গেছে, নতুন বসতি করার পর কিছু ইচ্ছে করেও লাগানো হয়েছে।

এ রকম করে গম, ধান, আরো কত কী ফলশস্য পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের আম গেছে মার্কিন দেশে, চীনের লিচু এসেছে এখানে, মর্তমান (Martaban) কলা, বাতাবি (Batavia), মোসম্বী (Mozambipue) নেবু, আজও নিজের নিজের নামে আদিস্থানের পরিচয় দিচ্ছে। তার উপর বীজ বাছাই করে, কলম করে, সার দিয়ে নানান উপায়ে ফলশস্যের জাতের উন্নতি করা হয়েছে। জঙ্গলের টোকো এঁসো আম, বাগানের ল্যাংড়া বোম্বাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ী বাঁদুরে নাশপতি, সুগন্ধী রসালো কাশ্মীরী pear হয়ে উঠেছে। আর শস্য তো সবি রকম-রকম বুনো ঘাস থেকে জাতে তোলা।

মানুষের এত দিনের চেষ্টাচরিত্রে তো এই ব্যাপার করে তুলেছে, তবে USSR-এর এ বিষয়ে আর নতুন দেখাবার থাকল কী।

আছে, ঢের আছে। এত দিন কী ভাবে চলে আসছে জান! নতুন জায়গায় যে বীজ পৌঁছল, তার ঝড়তি-পড়তি আপনি লাগল

তো লাগল, হেলায় কিছু বা বিশেষ ভাবে লাগিয়ে দেখা হল, বাঁচল তো বাঁচল নয় তো নতুন মাটিতে অচল বলে ছেড়ে দিলে। সার দেওয়ার ব্যাপারও সেই রকমই। হাতের কাছে যে সার আছে. বা জোটে, তাই গাছের গোড়ায় দিয়ে দেখা হল, ফল না পেলে খেয়াল ছুটে গেল, ফল পাওয়া গেল তো বাহাদুরি নিলে।

USSR-এর উদ্যম বল, অধ্যবসায় বল, ধারাবাহিক চেষ্টা বল, সে সব অন্য ধরনের। তারা গাছের চরিত্রই বদলে ফেলতে বসেছে। ভারতবর্ষের রোদে-মানুষ-হওয়া ব্রহ্মচারী, সে যদি তিব্বতের বরফে গিয়ে সাধনায় বসতে পারে, শীত দেশের লড়াকে জাত যদি ধনের লোভে আফ্রিকায় বালির তাতে আড্ডা গাড়তে পারে, তবে ওস্তাদের মতো ওস্তাদের হাতে পড়লে গাছই বা নিজের অভ্যেস বদলাতে শিখবে না কেন।

তবে গাছকে শেখাতে হলে অশ্রান্ত অনুসন্ধান চাই, অফুরন্ত পরীক্ষা চাই, অদম্য উৎসাহ চাই, সকলের উপর সমবেত চেষ্টা চাই। USSR-এর এই সব আছে বলেই এতকালের কৃষ্টির বাড়াও তাঁরা অনেক কারদানি দেখাতে পারছেন।

মাথা যতই খাটানো হোক, হাজার পড়াশুনা করা হোক, তাতেই মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় না, আনুরাগ্য-বিনা আনন্দলোক লাভ হয় না, সে বিষয়ে অঙ্গিরা ঋষি প্রকারান্তরে সাবধান করে দিয়েছেন। USSR-এর অনুরাগের কী পরিচয় পাওয়া যায়, তা পরে দেখা যাবে। কিন্তু যিনি যে-লোকের আকাঙ্ক্ষা করুন না কেন, আগে ইহলোকের অন্নসংস্থান আবশ্যক। সেই উপদেশ রাজর্ষি জনক হাতে-লাঙলে দিয়ে গেছেন। সে সনাতন দৃষ্টান্ত আধুনিক প্রণালীতে USSR কেমন ভাবে বিস্তার করছেন, তারি কিছু কিছু গল্প এই পালায় করা যাচ্ছে।

শ্রেষ্ঠের তল্লাশ

রুশের বিপ্লব নির্বিবাদে হতে পায়নি, সে তো ধরা কথা। বাইরের শত্রুদের আক্রমণ এক পক্ষে চলছিলই ; ভিতরেও বাগড়া দিচ্ছিল বিরুদ্ধ দল, যাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হওয়াটা মোটেই উপাদেয় ঠেকেনি ; আর প্রতিপত্তি প্রাধান্য নিয়ে রেষারেষি— তাই বা যাবে কোথায়। এসব নিয়ে কাটাকাটি মারামারি থমথমে হলে, বিপ্লবী কর্তারা যে-রাষ্ট্রের ভার পেয়ে কাজ চালাতে বসলেন, তার একেবারেই ভগ্নদশা।

রুশের সে সময়কার খবরের কাগজ পড়লে অবাক হতে হয়। শহরে ঘাস-গজানো রাস্তার দুধারে পোড়ো বাড়ি ; পল্লীর সব পতিত খেত আগাছা-ঢাকা ; কারখানার কলে মর্চে ; স্টেশনে সারবন্দী রেলগাড়ি অচল। ধন্য তাঁদের পুরুষকার, যাঁরা ছারখার রাষ্ট্রের ঘোর অন্ধকার রাতে দমে না গিয়ে, নগরে নগরে বিজলী দীপমালা পরাবার, গ্রামে গ্রামে দুনিয়া-ছাঁকা সেরা ফসল ফলাবার সংকল্প করতে পেরেছিলেন।

খালি ফাঁকা কল্পনা নয়। ঘরে বাইরে সেই অবিরাম অশান্তি সত্ত্বেও সেরা বিজ্ঞানীর দল বাছাই করে, কোন্ জায়গায় কিসের অভাব, যা আবশ্যক তা কোন্‌খানে কেমন করে পাওয়া যায়, সেই খোঁজে তাদিকে লাগিয়ে দিলেন।

সব দেশেই কিছু কিছু বিদেশী গাছগাছড়া দেখা যায়, কিন্তু সে বিষয়ে মার্কিন দেশের কাছে কেউ নয়। সেখানকার মানুষও যেমন পাঁচ দেশের আমদানি, সে দেশের পর্যটকরাও তেমনি নিজের খেয়ালমতো নানা জায়গার রকম বেরকমের গাছ এনে জুটিয়েছে। সেখান থেকে শেখবার অনেক আছে বটে, কিন্তু খামখেয়ালী ভাবে কাজ করলে

USSR-এর চলে না, তাই তাঁরা মার্কিন দেশের মাছিমারা নকল করেননি।

USSR-এর প্রথম দিকে সংকল্প (plan) ছিল, যে-প্রদেশে যা সহজে হয় সেখানকার বাসিন্দা দিয়ে দেশসুদ্ধ লোকের জন্যে তাই উৎপন্ন করিয়ে চারিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল তাতে আনা-নেওয়ার হাঙ্গাম অনর্থক বেড়ে ওঠে। চাষ আবাদই হোক, খনির কাজই হোক, বড়ো ভাবে করতে গেলে, গোরু ঘোড়া ঠেঙিয়ে কুলোয় না, নানা রকম কলকব্জা লাগে, কল তৈরির জন্যে কাছাকাছি কারখানা চাই, শ্রমিকদের টাটকা ফলতরকারি খেতে হলে দূর থেকে আনা চলে না। কাজেই সব প্রদেশে সব রকমের বন্দোবস্ত রাখতে হয়।

কর্তাদের কাছে চারদিক থেকে আবদার আসতে লাগল :

"আমাদের বরফের দেশ বলে আমরা কি গমের রুটি খেতে পাব না।"

"আমাদের এখানে পোকার উপদ্রব, ফলে পোকা ধরে না এমন গাছ চাই, নইলে আমাদের ফল খাওয়াই হবে না।"

"কারখানায় কুটনো কোটে কলে, কলের মাপের সমান গোল আলু হয় এমন জাতের বীজ চাই।"

—কত রকমের ফরমাশ।

এখন তো আর সম্রাটের গবর্নমেণ্ট নেই যে, প্রজারা বকাবকি করলে রাজদ্রোহ হয়। USSR-এ সকলেই শ্রমিক, শ্রমিকদের দরদ শ্রমিকে বোঝে; তাছাড়া এত সাধের এত কষ্টের বিপ্লব, বিপ্লবীর ছেলেপিলেরা রাজার হালে খেয়ে মানুষ না হলে মান থাকবে কেন। তাই USSR-এর চোখা চোখা জিনিস চাই, তড়িঘড়ি চাই, দুনিয়া হাতড়ে বেড়াবার

তর সয় না। ঠিক জিনিসটি যেখানে পাওয়া যাবে, বেছে বেছে সেখানে লোক পাঠাতে হবে।

মতলবটা তো ভালোই। তবে কোথায় কী আছে সেখানে গিয়ে না দেখে আগে থাকতে আন্দাজে লোক পাঠানো, সে কী রকম।

এ হেঁয়ালিতে বিজ্ঞানী ডরায় না। গণৎকার হিসেবে বিজ্ঞানীর বেশ হাতযশ আছে।

আগে তো বুধ মঙ্গল শুক্র বৃহস্পতি শনি, এই পাঁচটি বই গ্রহ জানা ছিল না। শনির চালচলন ঠিক অয়নমতো হচ্ছে না দেখে জ্যোতির্বিদ অনুমান করলেন, সে আরো দূরে কোনো অজানা গ্রহের টানে না পড়লে এমন গতিভ্রম হয় না ; আকাশের কোন্‌খানে সে গ্রহের দেখা পাওয়া উচিত তাও গুনে ঠিক করলেন ; তার পর সেদিকে দূরবীন যেমন তাক করা, অমনি বরুণ (uranus) গ্রহ ধরা পড়া। ক্রমশ এই প্রণালীতে খোঁজ করে দূরে কাছে আরো কত গ্রহ বেরল।

তেমনি যত রকম মৌলিক পদার্থ জানা ছিল সেগুলিকে পরমাণুর বাঁধুনি অনুসারে ধাপে ধাপে সাজাতে গিয়ে, রসায়নবিদ্ দেখলেন এক একটা ধাপ ফাঁক থেকে যায়। সে ফাঁকে বসাবার মতো পদার্থ উপস্থিত না থাকলেও, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ভরসা করে খোঁজ করায় নতুন নতুন ভূতের দেখা পাওয়া গেল।

উদ্ভিদেরও সব শ্রেণীভাগ করা হয়েছিল। নীল গোলাপ কেউ খুঁজতে বেরয়নি, কারণ শ্রেণীর মধ্যে তার ফাঁক ছিল না ; কিন্তু হলদে ফুলের মটর রুশে না থাকলেও, শ্রেণীতে তার ফাঁক থাকায় সেখানকার বিজ্ঞানী মনে জানেন কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। আমরা দেখে জানি এ দেশেই পেতে পারেন।

কিন্তু ফুলের বাগান করার জন্যে তো USSR ব্যস্ত হননি ; তাঁরা যে

সব খাদ্যের খোঁজে ছিলেন, তার কী উপায় করা হল সেই হচ্ছে কথা। এই ধরো না কেন, এমন এমন গম তাঁরা চান যার কোনোটা বরফের দেশে টিঁকতে পারে, কোনোটা যে দেশে মাসকতক টানা রাত সেখানেও ফলতে পারে, কোনোটা জলের অভাবে বা অতি বর্ষায় মরে না। একাধারে সব গুণ তৈরি না পেলেও, দু'চার রকমের জোড় মিলিয়েও দরকারমতো করে নেওয়া যেতে পারে। মোট কথা নানা গুণের বিচি চাই, যত রকমের পাওয়া যায় তত রকমই চাই।

'পুঁথিগত বিদ্যে' নিন্দের ছলে বলে, কিন্তু কাজে লাগাতে জানলে সে বিদ্যে বড়ো ফেলা যায় না। যে আমলের হোক, যে ভাষায় হোক, পুঁথিতে গমের বিষয়ে যা কিছু কথা পাওয়া যায়, পণ্ডিতেরা বসে গেলেন সেগুলোকে টুকে নিয়ে একত্র করতে। নানা যুগের পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে তাদের চলাচলের পথের যে সন্ধান পাওয়া গেল, তাই ধরে গমের চিহ্ন খুঁজতে লেগে গেলেন। সব মিলিয়ে গমের যত রকম খবর পাওয়া গেল, তাই এক ভূচিত্রের উপর সাজানো হল; এক এক গড়নের,—গোল, তেকোণা, চৌকো, তারার মতো,— ফুটকি দিয়ে এক এক রকমের গম বোঝানো হল।

কোনো দেশে একটা শস্যের চাষ অনেককাল ধরে চলতে থাকলে, প্রকৃতির নিয়মে সেখানে তার নতুন নতুন জাত উদ্ভব হতে থাকে; ক্রমে সেখানে তার হরেক রকমের নমুনা দাঁড়িয়ে যায়, আমাদের দেশে ধান চালের যেমন হয়েছে।

পরে আদিস্থান থেকে দেশান্তরের যাত্রীরা শস্যের দানা সঙ্গে নেওয়ায় তার প্রচার কী রকম করে হয়, তা তো দেখা গেছে। কিন্তু সব জাতের দানা নেওয়াও হয় না, যা নেওয়া হয় সব মাটিতে পড়েও না, যা পড়ে সব লাগেও না। এর থেকে এই তত্ত্বটুকু উদ্ধার হয়,

কোনো শস্যের যেখানে সব চেয়ে রকম বেশি, সেটাই তার আদি স্থান।

গমের ফুটকি চিহ্ন বসানো যে ভূচিত্রের কথা বলা হয়েছে, তাতে দেখা গেল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে আফগানিস্থানের এলাকায়, যত রকম ফুটকির ভারি ঠাসাঠাসি। নকশার উপর অন্য যেদিকেই লাইন টানা যায়, তা ধরে চললে ফুটকির রকম কমতে থাকে, দূরে মাত্র দু'এক রকমে গিয়ে ঠেকে। বোঝা গেল কোথায় গমের আদি স্থান,— সব রকম গমের বীজ যোগাড় করতে হলে যেতে হবে সেই আফগানিস্থানে।

এই যুক্তি অনুসারে নানা বীজের আদিস্থান বেরল। ১৯২৪ সালে দলে দলে বিজ্ঞানী খানাতল্লাশে রওনা হলেন এক এক বীজের আদি-স্থানে। যাঁরা গম আনতে আফগানিস্থানের দিকে বেরলেন, তাঁদের রোজনামায় দেখা যায় কী অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহ্য করে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে দিয়ে তাঁদিকে কেমন করে চলতে হয়েছিল।

তৈরি রাস্তা প্রায় কোথাও পাননি, স্রোতার উপর দিয়ে সাঁকো নাই, অনেকস্থলে পা পাতবারই জায়গা পাওয়া যায় না। হিংস্র জন্তুর কম্‌তি নেই, মানুষ ডাকাতেরও বাড়াবাড়ি। কাজেই অল্পে অল্পে অতি সাবধানে সন্তর্পণে এগোতে হয়েছিল— কোথাও রামচন্দ্রের মতো তড়বড়ে পাহাড়ী প্রপাতের উপর সেতুবন্ধ করে, কোথাও হনুমানের মতো পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, কিংবা পাহাড়ের গায়ে ঝুলতে ঝুলতে। মাঝে মাঝে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বোঝা নিজে বইতে হয়েছে, কতবার জিনিসপত্র খদে গড়িয়ে পড়েছে ; এক এক স্থান এমন দুর্গম যে, আধঘণ্টা অন্তর পরামর্শে বসে তবে এক পাহাড় থেকে পরের পাহাড়ে যাবার উপায় হয়েছে।

শেষে এক কাফিরের দেখা পেয়ে, তাকে কিছু বকশিশ কব্‌লে তাকে পথ দেখাতে রাজি করানো হল। তাও সে এক গ্রামের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে দে-পিট্টান—আর এগোতে সে সাহস পেল না।

পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গায়ে গায়ে গ্রাম বল নগর বল, যেসব ছোটো ছোটো বসতির মধ্যে বিজ্ঞানীর দল অবশেষে পৌঁছলেন সেগুলি অপরূপ—যেন বহুরূপীর দেশ।

সেখানকার লোকগুলোর কত ছাঁদের চেহারা,—কেউ বা ফরসা কটা চুল-দাড়ি ; কেউ বা কাফরীর মতো কালো, চুল কোঁকড়া। আর কত ঢঙের পোশাক,—কারো ফুলো পাজামা, কারো কষা ইজের ; কারো গায়ে আলখাল্লা, কারো খাটো কুর্তা, কারো বা পরনে আস্ত ছাগল-ভেড়ার চামড়া। ভাষাও সেই মতো রকমারি,—কেউ সূর্যকে বলছে আফতাব, কেউ য়েল্মার, কেউ বা সূন। কোনো গ্রামের লম্বাই চওড়াই নেই, কেবল খাড়াই, পায়রার খোপের মতো ঘরগুলো পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে, এক এক ঘর পাহাড়ের মধ্যে এক এক গর্ত, মাথার উপর একটু বারাণ্ডা বার-করা।

এমন আজব দেশ ভুঁই-ফুঁড়ে ওঠেনি,—এ হাল সেকালের গুণ্ডা-রাজাদের বিজয়কীর্তি। অসুরীয় (Assyrian) যোদ্ধা থেকে আরম্ভ করে সিকন্দর (Alexander) বাদশা, জঙ্গীস খাঁ, অনেকেই ভারতের ধনের লোভে হিন্দুকুশের পথ দিয়ে আনাগোনা করেছে, কত জাতের সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে। বিজয়ের মজা মারলেন তো কর্তারা, হেজিপেজি দলবলের ক্লেশের একশেষ। তাদের মধ্যে অনেকে ফিরে যাবার যন্ত্রণাভোগ এড়াবার জন্যে পাহাড়ের গুহাগহ্বরের মধ্যে লুকিয়ে রয়ে গিয়েছিল। আর আশপাশের উপত্যকায় যেসব বুনো চাষী, তারাও অনেকে বিদেশী সেনার উৎপাতে পাহাড়ের ভিতর পালিয়ে

এসেছিল। বর্বরজাতের যেমন হয়, নতুন কিছু নিতে জানে না; অভ্যস্ত আচারবিচার আঁকড়ে, থাকে,—এরা সবাই সেই রকম থাকল কাছাকাছি, কিন্তু মিশল না, বদলাল না, এগোল না, এখন পর্যন্ত তখনকার নমুনা হয়ে রইল।

পাহাড়ের ধাপে, স্রোতার ধারে ধারে, এদের যেসব ছোটো ছোটো খেত কালো পাথুরে জমির উপর সবুজ-বুটির মতো দেখা দিল, সেগুলি বিজ্ঞানীরা যেরকম অনুমান করে এসেছিলেন, ঠিক তাই— রকম বেরকম গমে ভরা—নরম দানার, কড়কড়ে দানার, গোল দানার, লম্বা দানার, কোনোটায় জল দেওয়া লাগে না, কোনোটা উৎকট শীতে দানা পাকায়। আর সেখানকার হাটবাজারগুলো তো ফলতরকারির প্রদর্শনী বললেও হয়,—এত রকমের কাঁকুড় ফুটি খরমুজ তরমুজ ডালিম বেদানা গাজর শালগম মুলো শাকসবজি,—জংলী থেকে আরম্ভ করে উৎকৃষ্ট জাত পর্যন্ত বাজারে পাশাপাশি রাখায় নিজের নিজের অভিব্যক্তির ধারা দেখিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আশ মিটিয়ে বস্তা বস্তা বীজ সংগ্রহ করলেন।

বিজ্ঞানীর যত দল দেশে দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা শেষে যে-যার অহিংস্র-লুঠের ভার নিয়ে স্বস্থানে ফিরে এলেন। আফগানিস্থান থেকে ৭০০০, পশ্চিম এসিয়া থেকে ১০০০০, মধ্য এসিয়া থেকে অগুন্তি, মার্কিনদেশ থেকে আলুর যত জাত আছে, সব মিলিয়ে লাখো রকমের বীজ এসে হাজির; সেগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন মাটি-আব-হাওয়ার প্রদেশে পরীক্ষার জন্যে চারিয়ে দেওয়া হল। যত্ন তদ্বিরের ত্রুটি ছিল না, তবুও পরীক্ষায় পাস হল অল্পই,—যেমন এক জাতের গাছ বরফের তলায়ও বেশ বড়ো বড়ো আলু গজাতে লাগল, মেরুর ধার পর্যন্ত শালগমে কপিতে ছেয়ে গেল, নতুন নতুন গমের জাত এখানে ওখানে লেগে গেল—কিন্তু বেশির ভাগ হল ফেল।

কতক রকমের আয়েবের ওষুধ হতে পারে,—শুখনো মাটিতে জল আনা যায়, লম্বা দিনের অতিরিক্ত আলো ছাউনি দিয়ে কমানো যায়, লম্বা রাতের অন্ধকার বিজলি বাতি দিয়ে ঘুচিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ওষুধের উপর নির্ভর করে জীবনযাত্রা চালানো মুশকিল, তার খরচও বেজায় ; উপযুক্ত অভ্যেসের জোরে শরীর রাখতে না শিখলে চলে না। অবশ্য বুড়ো-ধাড়িকে শেখানো যায় না, শিক্ষার ফল পেতে হলে ছাত্রকে কচি-বেলায় হাতে নিতে হয়।

গাছকে শেখাবার বিষয়টা কী—শাস্ত্রে যাকে বলে তিতিক্ষা—তার মানে শীত গর্মি, খিধে তেষ্টা, যখন যা ঘটে, অম্লান বদনে বর্দাস্ত করা। তা শেখাতে হলে গাছের বীজের জন্যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম খোলা দরকার,—করা হলও তাই।

আশ্রম স্থাপন হল এক লম্বা চালা-ঘরে। তোড়যোড়ের মধ্যে জলের চৌবাচ্চা, বালতি ঝাঁঝরি কোদাল নিড়ানি দাঁড়ি-পাল্লা আর বিশেষ করে তাপমান যন্ত্র ; আয়োজনের মধ্যে ইচ্ছেমতো ঘরটাকে ঠাণ্ডা গরম আলো অন্ধকার করার বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। এই আশ্রমে গমের বীজকে কিভাবে ঠাণ্ডা সওয়ার সাধনা করাল, তার রিপোর্টটা দেখা যাক।

মাটিটাকে কুপিয়ে আলগা করে তাতে এক পত্তন বীজ পোঁতা হল। ঘরটাকে বরফের চেয়ে চার ডিগ্রী ঠাণ্ডা করে রাখা হল। মাটির ঢাকার মধ্যে বীজগুলো গরম হতে না পায় সেজন্যে মাঝেমাঝে মাটি আঁচড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকিয়ে দেওয়া হল। জলের ছিটে দিয়ে দিয়ে বীজকে তাজা রাখা হল। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমে যাবার মতো হলে কাপড় চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। এ রকম কৃচ্ছ্রসাধনের পর বসন্তকালে যে

বীজের চারা বেরল, সেগুলিকে কিছু উত্তর দেশের কিছু দক্ষিণ দেশের মাঠে রোপণ করে বাইরের সংসারে বার করে দেওয়া হল।

ডান হাত বরফ জলে, বাঁ হাত গরম জলে ডুবিয়ে রেখে দুই হাত সমান জলে দিলে সে জল ডান হাতে গরম, বাঁ হাতে ঠাণ্ডা লাগবে,— তার মানে জীবের বোধশক্তি তাপমান যন্ত্রের মতো কাজ করে না। উত্তর দেশের বসন্তের গোড়ায় রোদের তাপ প্রায় না থাকলেও, বরফী-শীতে পালন-করা গমের চারা সেইটুকুই পর্যাপ্ত বলে মাথায় করে নিল, তাতেই তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠায় বেশি-শীত পড়ার আগেই শীষ ধরে পেকে গেল। বরফ পড়লে কী হবে না হবে সে সমস্যা মিটে গেল, লম্বা রাতের ভাবনাও আর ভাবতে হল না। দক্ষিণেও শীতের সময় জলের অভাব হয়, সেই শুখো পড়ার আগেই সেখানকার গম কাটা সারা। ঠিক ওষুধ পড়লে সে সব দিক দেখে নেয়।

মানুষের বেলায়ও কি তাই হয় না। যে ছেলে কষ্ট সয়ে মানুষ হয়েছে, সে বড়ো হয়ে অল্পে সন্তুষ্ট থাকে, মজবুত শরীর-মন নিয়ে সংসারে তেড়েফুঁড়ে ওঠে, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দান নিয়ে বেশ আনন্দে থাকতে পারে, বিলাসের খরচ যোগাবার জন্যে শরীর পাত করে তাকে অকালে বুড়িয়ে যেতে হয় না।

তবুও একটা কথা বাকি রইল। দরকারী অভ্যেস কচি বয়সে করাবার কথা বলা হয়েছে। তার চেয়ে বেশি ফল হয় যদি আরো আগে ছাত্রকে ধরতে পারা যায়। বুদ্ধিতে বৃত্তিতে সুশিক্ষিত[১] কনেকে যদি

১ বিচার করে কাজ করার অভ্যাস হলে বুদ্ধিকে সুশিক্ষিত বলা যেতে পারে; আর বৃত্তিকে সুশিক্ষিত বলা যায় যদি সব অবস্থায় রস টানতে পারে, বিশেষত নীর থেকে ক্ষীর তোলার মতো সুখদুঃখ মেশানো সংসার থেকে সুখটা ছেঁকে আদায় করে নিতে পারলে।

উপযুক্ত বর দেওয়া যায়, ছেলে পেটে থাকতে যদি মাকে সুস্থ সবল প্রফুল্ল রাখা হয়, তাহলে বংশের উন্নতি মারে কে। একথা মানুষ পশু পাখি পোকা গাছ সবেতেই খাটে।

বিধাতার দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকা আমাদের দেশে একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে ; এভাবে স্বাধীন চিন্তা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে লাভের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি সুখশান্তি সবেতেই জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। করে খেতে না শিখিয়ে মেয়েটাকে বলে অরক্ষণীয়া, শেষে তাকে দেয় যে-সে পাত্রের হাতে ফেলে, তার ভোগ যখন ভুগতে হয় তখন কপাল চাপড়ে বলে "অদৃষ্ট"। বিয়ের পর পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা রোখবার চেষ্টা না করে তাদিকে বলে বিধাতার দান ; এদিকে বাপের রোজগারে কুলোয় না, মায়ের শরীরে বয় না, কাজেই সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা আয়ু সবেরই কম্‌তি পড়ে যায়। ফলে সংসারটা যেরকম নরক হয়ে দাঁড়ায় তার উপযুক্ত নাম মনে না এলেও, গলা ছেড়ে টেবিল চাপড়ে বলা যেতে পারে যে তার কাছে ছেলে না-হওয়ার পুন্নাম নরক ছেলেখেলা।

USSR-এর ভাব এর ঠিক বিপরীত। পূর্বজন্মের বা দুর্দৈবের উপর দোষ দিয়ে বসে তো তাঁরা থাকেনই না, উলটো নিজের পুরুষকারের জোরে জন্মের পূর্ব থেকে দোষবর্জন গুণবর্ধন কেমন করে করা যায়, সেই চেষ্টাতেই তাঁরা আছেন। তারি কিছু কথা এবার বলা যাক— তাতে আমাদের হাহাকার ঘোচাবার উপায় যদি নাও হয়, তাঁদিকে বাহবা দেবার সুখটা তো পাওয়া যাবে।

কুলশীলের রহস্য

ড্রসোফিলা (Drosophila) নামে কলা-খেকো এক রকম মাছি হয়, বিজ্ঞানীরা তাই পুষতে লেগে গেলেন। রাম! রাম! ও কেমন ধারা? শেষটা মাছি খাবে না কি।

আরে, ব্যস্ত হও কেন, অমন তড়বড় করে সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়া ভালো নয়। খাবার জন্যে পাঁঠা পোষে বলে আর কোনো কারণে কিছু পুষতে নেই বুঝি। মাছি পোষার কত সুবিধে একবার ভেবে দেখো। প্রথমত রাখতে বেশি জায়গা লাগে না, লোহার জালের একটা বাক্সে হাজারে ধরে; দ্বিতীয়ত খাইখরচ নেই বললেও হয়, এক পয়সার খোরাকে অনেক দিন চলে; সবের উপর ওরা দশদিন বয়সে ডিম পাড়তে শুরু করে, একমাস না যেতে মাছি হয় দিদিমা।

তাহলে প্রমাণ হল কী, না—

মাছি সহজে বাড়ে
মাছি সস্তায় বাড়ে
মাছি ঝটপট বাড়ে—

আহা, ওকথা এত আড়ম্বর করে নাই বা বোঝালে, মাছি বাড়িয়ে কী হবে সেইটে খুলে বলো দেখি।

তবে বলি শোনো।

মাস্টার মশায়কে যেজন্যে মাইনে দেওয়া মাছিবংশকে সেইজন্যে গ্রাসাচ্ছাদন যোগানো,—উদ্দেশ্য, বিদ্যেলাভ। মাছির মহা ভাগ্যি, মানুষকে ওরা প্রজনন-তত্ত্ব শেখাবার চেয়ার পেয়ে গেছে।

প্রজনন-তত্ত্ব কথাটা যেমন কটো-মটো, বিষয়টাও তেমনি—ভাগ্যিস্ ওর মধ্যে ঢোকার কোনো আবশ্যক নেই। USSR-এর যন্ত্র-চালানো

আমাদের বোঝা নিয়ে বিষয়, তার জন্যে যেটুকু দরকার, তাই সাদা করে ভাবার চেষ্টা করা যাক।

বাপের মতো হাত, কি মায়ের মতো নাক, এ সব সন্তানে পেয়েই থাকে; তবে হাত-ভাঙা বাপের নুলো ছেলে, কি নাক-কাটা মায়ের বোঁচা ছেলে, তা হয় না। আবার সন্তানের এমন গুণ-দোষও দেখা যায়, যা মা-বাপে নেই। এই হের-ফেরের হিসেবটা পেলে তবেই বোঝা যাবে একটা প্রাণীকুলের ভিতর কোনো বিশেষ গুণ আনতে হলে তার কী উপায় করা যায়।

প্রাণীর দেহ কত অগুন্তি, রকম বেরকমের কোষ দিয়ে গড়া; সে দেহ তো মা-বাপের কাছ থেকে সন্তান আস্ত পায় না, পায় শুধু একটি যুগল জননকোষ। জননকোষ বলতে দেহের নিভৃত স্থানে কতকগুলি বিশেষ কোষ, যারা স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় থাকে। সুযোগ পেয়ে দু' রকম দুটো জননকোষের মিলন হলে একটি পূর্ণাঙ্গ কোষ হয়ে, সে আলাদা জীবন আরম্ভ করে, পিতৃকুল মাতৃকুল দুই দিক থেকে পাওয়া গুণ অনুসারে নতুন দেহ গড়তে থাকে।

আরো একটু কথা আছে। অশরীরী গুণগুলি সন্তানকোষে চলে আসে না,—সে মা-বাপের জননকোষ থেকে পায় শুধু গুণের কারিগর। জননকোষগুলি নিজেই এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীন দিয়ে কষ্টে দেখা যায়। তাদের মধ্যে আবার গুণের জননিকা (genes) যেগুলি আছে, তারা অণুর তুলনায়ও অণু, তারা ধরা পড়েছে মনোবীন দিয়ে, অর্থাৎ যুক্তির জোরে। এই জননিকাগুলির ক্রিয়ায় সন্তানের নতুন দেহ বংশের সনাতন দেহের সাদৃশ্য পায়।

এই জননিকা-সমেত জননকোষগুলি দেহের নিভৃত স্থানে থাকায়, বাইরের আঘাতে দেহের অন্য কোষগুলি জখম হলেও সেখানে সে

চোট গিয়ে লাগে না, তাই তার ফল সন্তানে বা বংশের ধারার মধ্যে পৌঁছয় না।

তা যেন হল, কিন্তু অন্তত বংশের যত রকম দোষগুণ, প্রত্যেক সন্তানে তা পায় না কেন। সে কতক বাপের দিক থেকে, কতক মায়ের দিক থেকে বেছে নেয়; মা-বাপে যা দেখা যায় না এমন গুণও পায়,—এ রকম হয় কী করে।

গোড়াকার কথা এই যে, যখনই স্ত্রীদেহে পুরুষদেহে জননকোষগুলি অর্ধাঙ্গ হয়, তখন থেকেই গুণের একটা বাছাই ঘটে, যার দরুন তাদের মধ্যে জননিকার সমান ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় না। ঠিক কী রকম করে কী হয় বর্ণনা করার চেষ্টা করতে গেলে আলাদা করে দেহতত্ত্বের পালা গাইতে হয়, তার অবসর তো এখানে নেই। তবে একটা কৌশল করা যেতে পারে।

কথায় বলার চেয়ে অনেক সময় নকশা দেখিয়ে সহজে বোঝানো যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে যন্ত্র ব'লে একরকম নকশার সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব বোঝাবার প্রণালী আছে। অত বড়ো কথায় কাজ কী, একটা বাড়ি তৈরি করতে হলে কাগজের উপর রেখার ঘর কেটে, এখানে ওখানে চিহ্ন বসিয়ে কী রকম বাড়ি চাই তা রাজমিস্ত্রীকে বেশ বুঝিয়ে দেওয়া যায়,—যদিও মাটির তলায় থাকবে ভিত, উপরে উঠবে দেয়াল, কোথাও লাগবে ইঁট কোথাও কাঠ কোথাও লোহা,—আসলে-নকশায় চেহারার মিল কিছুই থাকবে না।

সেই রকম একটা রূপক দিয়ে বংশধরদের মধ্যে গুণের যাওয়া আসার হেরফের বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে; কিন্তু মনে রাখতে হবে, আসলের সঙ্গে রূপকের রূপের মিল থাকবে না, সূক্ষ্ম-খেলা সহজে স্পষ্ট করতে হলে স্কেল বদলে মোটামুটি দেখাতে হবে।

জনন-কোষগুলোকে এক একটা গ্রামের মতো ভাবা যাক, যার মধ্যে গুণের জননিকাগুলি যেন তাঁতি ছুতোর কামার কুমোর কাঁসারি, পাঁচ রকমের কারিগর। তার পর মনে করা যাক, কর্তৃপক্ষের একটা নূতন গ্রাম পত্তন করার ইচ্ছে হয়েছে।

হুকুম জারি হল—"ক, খ, এই দুই গ্রাম থেকে পাঁচ রকমের পাঁচ জন করে, মোট দশ জন কারিগর সদরে পাঠানো হোক, তার মধ্যে থেকে পাঁচজন বাজাই করে গ-গ্রামে বসানো হবে।"

এই পাঁচ জোড়া কারিগর জড় হলে তাদিকে একটা অন্ধকার ঘরে পোরা হল, যার দরজা কোন্‌দিকে তারা কেউ জানে না হাতড়াহাতড়ি করে দরজা পেয়ে সেখান থেকে প্রথমে যে পাঁচজন বেরিয়ে এল, তারা যে যার বাড়ি ফিরে গেল। যে পাঁচজন পিছিয়ে থেকে আটক পড়ে গেল, তাদিকে পাঠানো হল গ-গ্রামে বাস করতে।

এই যে অন্ধকারে ঢিল-মারা গোছের কারিগর বাছাই, নতুন গ্রাম সম্পর্কে এর ফলাফল একটু ভেবে দেখা যাক।

প্রথমেই তো বোঝা যাচ্ছে যে, গ-গ্রামে পাঁচজন গেল বটে, কিন্তু তারা পাঁচরকমের কারিগর নাও হতে পারে। অন্ধকারে ঠেলাঠেলির পর হয়তো ক-খ-গ্রামের দুই তাঁতি নতুন গ্রামে যাবার দলে ধরা পড়ল, দুই কামারই ছাড়া পেয়ে নিজের গ্রামে ফিরে গেল। গুনতিতে ঠিক রইল, রকমে হল বেশ কম। সে অবস্থায় প্রথম ফল এই দেখা যাবে যে, গ-গ্রামে তাঁতের কাজ চলবে জোরে, কিন্তু সে গ্রামের লোককে লোহার জিনিস বাইরে থেকে কিনে আনতে হবে।

আবার ধরো, ক-গ্রামের তাঁতি বোনে শুধু মোটা ধুতি, খ-গ্রামের তাঁতি ফুল-পেড়ে শাড়ি বুনতে জানে; অথচ গ-গ্রামে

তাঁতের সরঞ্জাম মোটে একপ্রস্থ। নতুন গ্রামে ফুলপেড়ে শাড়ি কজ'নেই বা কিনতে পারবে, মোটা ধুতির বেশি কাটতির আশা দেখে দুজনে মিলে ঐ কাজেই লেগে গেল। তবুও খ-গ্রামের সে তাঁতি থাকায়, গ-গ্রামে ফুলপাড় বোনার বিদ্যেটা চাপা থাকলেও মারা পড়ল না। যা হোক, দ্বিতীয় ফল এই দেখা যাবে যে, গ-গ্রামে মোটা ধুতির কারবার জেঁকে উঠল।

তৃতীয় ফল প্রকাশ পেতে পারে যখন ঙ-গ্রাম পত্তনের বেলা গ-ঘ-গ্রামের উপর কারিগর জোগাবার ভার পড়বে। ঘ-গ্রামের তাঁতি হয়তো গামছা ছাড়া কিছুই বুনতে পারে না, অথচ বাছাইয়ের গোলমালে সে নতুন গ্রামে গেলই না, সেখানে পৌঁছল একা ফুলপাড়-বোনা তাঁতি। তাতে ঙ-গ্রাম হঠাৎ হয়ে উঠবে ফুলপেড়ে শাড়ির মোকাম। সাধারণ লোকে তাজ্জব হয়ে বলাবলি করতে পারে—"মোটা ধুতি গ্রামের আর গামছা-বোনা গ্রামের কারিগররা বসল ঙ-গ্রামে,—সেখানে ফুলপাড় তৈরির বিদ্যেটা এল কোত্থেকে?" গ্রামপত্তনের ইতিহাস যে গোড়া-থেকে জানে সেই এ রহস্য ভেদ করে দিতে পারবে।

এমনও হতে পারত যে ঙ-গ্রামে গ-ঘ গ্রাম থেকে দুরকমেরই তাঁতি পৌঁছল। সে অবস্থায় গামছায় খাটুনি কম কাটতি বেশি—বিজ্ঞানের ভাষায় এ গুণ ডমিন্যান্ট (dominant) হওয়ায় ফুলপাড়ের বিদ্যেটা আবার চাপা পড়ল—বিজ্ঞানের ভাষায় রিসেসিভ (recessive) হল কিন্তু তবুও মরল না। তাহলে হয়তো এ রকম ভাবে চাপা পড়তে পড়তে চ ছ জ-ঝ-গ্রাম পেরিয়ে ঞ-গ্রাম পত্তনের সময় 'ফুলপাড়-বোনা তাঁতি নিজের বিদ্যে জাহির করার সুবিধে পেল। ততদিন পর

এই ফুলপাড়-ধারার গোড়া খুঁজে বার করতে ঐতিহাসিকেরও ধাঁধা না লেগে যায় না।

এই রূপক আরো খেলিয়ে চললে, অনেক রকমের হেরফেরের অন্ধিসন্ধি পাওয়া যেতে পারে। আপাতত যেটুকু বলা হল, তাতেই আমাদের এ পালার কাজ চলবে।

জটিলতা কমাবার জন্যে আমাদের এই রূপকে মাত্র পাঁচ রকম কারিগরের কথা বলা হয়েছে। আসলে মানবদেহে বিশ-পঁচিশটা আলাদা রকমের জননিকা ক্রিয়া করতে থাকে, তার দরুন ফলাফলও খুব ঘোরালো হয়। এমনও দেখা যায়, মা বুদ্ধিমতী, বাপও ধীরস্থির, অথচ মা বা বাপ কারো ছিটগ্রস্ত পিতামহ বা মাতামহের একটি জননিকা বংশপরম্পরার ভিতর দিয়ে ঘুরে ফিরে এসে পড়ায়, এদের এক ছেলে হল পাগল। আবার বাপ সাদাসিধে, মা পাঁচপেঁচী, অথচ বংশের দুই দুই ফ্যাকড়া ধরে নানা গুন দৈবাৎ এক দেহে জুটে পড়ায়, ছেলে হল মহাপুরুষ।

পূর্বপুরুষদের গুণাগুন খোঁজ করে বার করা যায়, বংশধরদের গুণাগুন তো দেখতেই পাওয়া যায়, মাঝপথের গুণ বাছাবাছি ব্যাপার ঠিকমতো জানা নেই বলে আমাদের নকশায় অন্ধকার ঘরের কথা বলা হয়েছে। কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা হয় জানা থাকলে বলা হয় নিয়মে চলছে; নিয়ম না জানা থাকলে বলে দৈবাৎ ঘটেছে। সৃষ্টির প্রকরণ সম্বন্ধে মানুষের বিদ্যে যত বাড়ছে, ততই জগৎপ্রবাহ দৈবের রাজ্য থেকে নিয়মের এলাকায় এসে পড়ছে।

কুলের মধ্যে শীলের লুকোচুরি খেলাটা মাঝে মাঝে অন্ধকারের আড়ালে হতে থাকলেও, তার যতটুকু জানতে পারা গেছে তা দিয়ে জাত বদলের কাজ মোটামুটি চালানো যায়। ফরশা বর কনে ক্রমাগত

মিলিয়ে চললে ফরশা পরিবার দাঁড়িয়ে যাবে—সে কথা সবাই জানে। লাল গোরুতে সাদা গোরুতে জোড় মেলাতে থাকলে পর পর কতকগুলি লাল, কতকগুলি সাদা, কতকগুলি মাঝামাঝি রঙের বাচ্ছা হবে, তাও গুণে বলার প্রণালী বিজ্ঞানীরা বার করেছেন। পাহাড়ী শক্ত নাশপাতির সঙ্গে নিচের রসালো ক্ষীণজীবী নাশপাতি মিলিয়ে মজবুত অথচ সুস্বাদ নাশপাতির জাত তৈরি হয়েছে। আবার কখনো বা উলটো উৎপত্তিও হয়ে পড়ে; তলায় মুলো উপরে কপি হবে আশায় দুই গাছ মেলাতে গিয়ে শিকড় হল কপির মতো, পাতা হল মুলোর।

গাছের পুংকোষ থাকে ফুলের রেণুর মধ্যে, স্ত্রীকোষ থাকে ফুলের তলায় একটা বিশেষ আধারে। স্বাভাবিক অবস্থায় রেণু চালাচালির কাজ মৌমাছিতে বা অন্য পোকায় করে, তারা মধুর ঘটক-বিদায় পায়। মানুষের ইচ্ছেমতো জোড় মেলাতে হলে, তুলি দিয়ে রেণু তুলে নিয়ে স্ত্রীকোষের আধারে দিয়ে দিতে হয়।

আমাদের দেশের সেকেলে ঘটকেরা পাত্রপাত্রীর লক্ষণ মিলিয়ে, বিয়ে দেবার উপযুক্ত কিনা ঠিক করে দিত। আজকাল গাছের ওস্তাদেরাও গাছের আবশ্যকমতো জাত তৈরি করার উদ্দেশ্যে লক্ষণ দেখে গাছের জোড় মেলায়। বিদায় হবার পর ঘটকের ভুল ধরা পড়লে সে থোড়াই কেয়ার করত, কিন্তু গাছের ওস্তাদ ফলোদয় না হওয়া পর্যন্ত কাজে লেগে থাকে। ভুলের পর ভুল হলেও সে দমে না, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ-গাছ ও-গাছ সে-গাছ মিলিয়ে যা চায় তা পাবার চেষ্টা ছাড়ে না। দোষের মধ্যে এতে বড্ড সময় লাগে। বৎসরান্তে যতক্ষণ আবার ফুল না ফোটে, নতুন পরীক্ষায় হাতই দিতে পারা যায় না।

জননকোষ বা তার ভিতরের জননিকার উপর বাইরের ঘটনার প্রভাব যে একেবারেই পৌঁছয় না, তাদের কোনো রকমেরই পরিবর্তন

হয় না, তা তো নয়। মানুষ ও-বিষয়ে হাত লাগাবার আগেই প্রকৃতির মামুলী-নিয়মেই কত নতুন নতুন উন্মেষ প্রকাশ পেয়েছে। নইলে আদি পক্ষীজোড়ার বংশধরদের মধ্যে রাজহংসই বা ধবধবে সাদা, ময়ূরই বা রং-বেরঙে চিত্রিত হল কেমন করে। এ পর্যন্ত প্রাণীদের জাত বদলানো সম্বন্ধে তো প্রকৃতিরই অপেক্ষা করে চলতে হয়েছে। দৈবাৎ কোনো সুবিধেজনক নতুন গুণ জন্মাতে দেখলে তবেই তাকে জাতের মধ্যে কায়েম করার তদ্বির করা হয়েছে,—যেমন এক মেষপাল একটি খাটো পায়ের বিকৃত বাচ্ছা পেয়ে তাই দিয়ে বেঁটে ভেড়ার জাত গড়ে তুলল, যারা বেড়া টপকে পালাতে না পারায় তাদিকে বেশ সহজে আগলে রাখা যায়। তবে প্রকৃতিকে নিজের চালে চলতে দিলে এক আধটা নতুন গুণ জাতের মধ্যে বসে যেতে, অভিব্যক্তির পথে জাতের দু এক পা এগোতে, যুগের পর যুগ কেটে যায়।

সংস্কার আঁকড়ে থাকা সম্বন্ধে জননিকাগুলো হিন্দুমানুষকেও হার মানায়। কোনো বিজ্ঞানী একজোড়া বাবুই পাখি খাঁচার মধ্যে পুষেছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় তারা যদিও পোকা খায়, তিনি তাদের জন্যে ছাতু খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন আর ঘাসের বোনা বাসার বদলে টিনের কৌটোর মধ্যে তাদের থাকার জায়গা দিয়েছিলেন। তাতেই তারা বেশ রইল, জোড় বাঁধল, ডিম পাড়ল, বাচ্ছা হল। সে বাচ্ছারা ঐভাবেই বড়ো হল, তাদেরও খাঁচার মধ্যে বাচ্ছা হল। কাজেই এসব বাচ্ছারা পোকা ধরে খাওয়া, ঘাস বুনে বাসা বাঁধা কিছুই শিখতে পেল না। কিন্তু সেই বাচ্ছার বাচ্ছাকে যখন খাঁচার বাইরে ছেড়ে দেওয়া হল, তারা প্রথম থেকে ইতস্তত না করেই পোকা ধরে খেতে লাগল, ঘাস কুড়িয়ে বাসা বাঁধতে লেগে গেল,—যেমন-তেমন বাসা নয় ঠিক সেই বোতল গড়নের। জননিকাদের মধ্যে পূর্বস্মৃতি বা সংস্কার (নাম যাই

দাও) অটুট ছিল বলেই তো খাঁচায়-মানুষ সে-বাচ্ছাদের পক্ষে এসব করা সম্ভব হল।

মানবজাতি ডেপুটি-স্রষ্টার পদ পাবার পর, পরিবর্তনের কাজ কতকটা তাড়াতাড়ি এগিয়েছে বটে। খরগোশের মতো জীব অশ্ব হয়ে উঠল; মানুষের শত্রু যে নেকড়ে, সে মানুষের মিত্র কুকুর বনে কত রকম জাতের বাহার দেখাল; ঘাসের বিচি গমে ধানে গুলজার হল। তবু এসব হতে সময় নিয়েছে কম নয়; কারণ এ পর্যন্ত জননকোষের উপর আক্রমণ, তাদিকে একটু প্রগতিপরায়ণ করার চেষ্টা,— তার উপায় জানাও ছিল না, করাও হয়নি।

সেইজন্যে দশ দিন বয়সে যে মাছি বংশবৃদ্ধি করে, তাদের উপর বিজ্ঞানীদের এত ঝোঁক। কী উপায়ে জাতের মধ্যে বিশেষ গুণ আনতে বা তা থেকে দোষ ছাড়াতে পারা যায়, তার হিসেব পাবার জন্যে এই Drosophila মাছিদের নিয়ে বছরে ছত্রিশবার নাড়াচাড়া করা চলে। মাছিদের স্বচ্ছ নরম দেহ, উপরে কিরণ ফেললে ভিতর পর্যন্ত তার তেজ প্রবেশ করে, শরীরের যে-কোনো জায়গায় তেজী আরক ফুঁড়ে দেওয়া সহজ; কোনো কোনো অঙ্গচ্ছেদ করলেও তাদের প্রাণের হানি হয় না।

এখন মাছির উপর X-কিরণ ফেলে বিজ্ঞানীরা তাদের জননিকাকে উত্তেজিত ক'রে তাদের কত রকম চেহারার অদল-বদল করাচ্ছেন— খাটো ডানা, লম্বা ডানা, সাদা চোখ লাল চোখ, আড়া খুদে বা তেধেড়েঙ্গা; কেউ আলোর দিকে ওড়ে, কেউ আলো দেখ্‌লে পালায়, গুণেরও কত রকম ওলট পালট।

তবে, উপযুক্ত রকম কিরণ বা আরক লাগাতে পারলে, কলার বহরের চালের দানা, কুমড়োর মাপের আলু, একবেলার খোরাক যোগাবার মতো এক একটা আম, এ সবই বা তৈরি হবে না কেন।

মামলার নিষ্পত্তি না হতেই তা নিয়ে মন্তব্য-প্রকাশ অপরাধের মধ্যে গণ্য। গাছে কাঁঠাল থাকতে গোঁফে তেল দিলে সেটা অপবাদের কারণ হয়ে থাকে। এই নজির অনুসারে প্রজনন-পরীক্ষা আর একটু না এগোলে ভাবী ফলাফলের সুখস্বপ্ন দেখে জিভে জল না আনাই সমীচীন।

তাই বলে মানুষের হিতৈষী বিজ্ঞানীদের সফলতা কামনায় দোষ নেই। তবে কিনা, USSR-কী জয়। হাঁকার আগে আরো একটু বিবেচনা করা লাগবে।

ঈশাসংকট

খ্রীস্টান সাধক বলেন, প্রেমের কারণে পিতৃস্বরূপ পরমেশ্বর সৃষ্টির মধ্যে বহু হলেন,—শুধু তা নয়, এমনি আত্মহারা হলেন যে, জগতে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না, বিজ্ঞান দিয়ে তাঁকে ধরা-ছোঁয়ার চেষ্টা বৃথা। প্রেমের জোরে নিজের মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করলে তবে মাতৃরূপা জীবাত্মা পুত্র-ভগবানকে নবজন্ম দেন।

আমাদের ঋষি আর এক ভাবে বলেছেন, জগতের মধ্যে যত জগৎ, ঈশা সে সব ছেয়ে আছেন।

সৃষ্টি হল প্রবাহের মধ্যে প্রবাহ। যেটুকু আমাদের গোচরে আছে তাতেই দেখতে পাই,—বিশ্বের মস্ত বড়ো ইতিহাসের মধ্যে সৌরজগতের অভিব্যক্তি, তার ভিতর এই পৃথিবীর অভ্যুদয়, পৃথিবীর উপর নানা প্রাণীর জীবনধারা, এক এক জাতের প্রাণীর মধ্যে কত ব্যক্তি, ব্যক্তির মধ্যে কত কোষ, কোষের মধ্যে নতুন ব্যক্তির জননিকা। জড়পদার্থও ক্রমশই নিরেট বস্তুর কোঠা ছেড়ে প্রবাহের দলে এসে পড়েছে।

কোনো না কোনো ঈশার প্রভাবে তো এই সব প্রবাহগুলি যে-যার

নিয়মে চলে, কিন্তু পরমেশ্বরকে সত্যিই তো তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আলাদা প্রবাহের চালকও যেন আলাদা,—সব সময় তাদের এক মতি থাকে না, অন্তত তাদের-চালানো প্রবাহগুলির এক গতি ঘটে না, বিরোধ বাধে, একের গড়া অন্যে ভাঙে।

প্রকৃতির অম্বিকা-মূর্তির যে সামঞ্জস্য—যাকে বিজ্ঞানীরা ব্যাল্যান্স অব নেচার (Balance of Nature)বলেন—তার বাইরের পরিপাটী ঠাট শান্তির ছবি, অথচ তার তলে তলে করালীর রণরঙ্গ ; বাঁচার জায়গা, বাঁচার সুযোগ, বাঁচার উপায় নিয়ে ছোটো বড়ো প্রাণীদলের হরদম ভীষণ রেষারেষি চলেছে ; গোছগাছ নেই তা নয়, কিন্তু ফেলা-ছড়াও বিস্তর। পরস্পর সাহায্যের মাধুর্য, নিষ্ঠুর খাওয়াখাওয়ির কদর্যতা পাশাপাশি পাওয়া যায়।

এই অবস্থার কথা ভাবলে, "যা করেন ভগবান," এই বাঁধি বুলিতে সায় দিতে মন সরে না। ভগবান গর্তে ফেলেন আবার সেই গর্ত থেকে তোলেন ; বাঘ দিয়ে মানুষ খাওয়ান, মানুষের বন্দুকে বাঘ মারান ; যাকে দুষ্ট বুদ্ধি জোগান তাকেই দুষ্ট কাজের সাজা দেন,—এ ভাবে কথা কইলে কোনো তত্ত্বের সন্ধান তো মেলেই না, মাঝে থেকে ভগবান নামের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়।

জড়ের বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়ে প্রজ্ঞাশক্তি নিজের ক্রমবিকাশের পথ খুঁজে ফিরছে, ভুল পথে বার বার কিছুদূর চলে আবার পালটে নতুন পথ ধরতে হচ্ছে,—চেহারাটা সেইরকম লাগে। কোথায় যাবার পথ? বহু থেকে আবার একে পৌঁছবার নাকি? এই চেষ্টাই যেন প্রকৃতির লীলা।

মাঝপথে নানা খণ্ড-ঈশার আঁকুবাঁকু দেখে পরম মহেশ্বরের চরম অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব সাব্যস্ত করে বসার ঝোঁক চাপলে, সাবধান

থাকা উচিত। জ্ঞানের নিচুস্তরে থাকতে উঁচু রকমের প্রশ্ন তুললে, সদুত্তর পেলেও অনেক সময় তার মানে করা যায় না। এক ইংরেজ বিজ্ঞানী এর একটা মজার উদাহরণ দিয়েছেন।

মনে করো, এক অঙ্কনবীশ আলোর গতি গুনতে শিখেছে, কিন্তু জ্যোতিষ্কের হালচাল পর্যন্ত তার বিদ্যের দৌড় নয়। একদিন, সামনের বনের উপর এক রামধনু দেখে, তার গুনে বার করার শখ হল, ঐ পাঁচরঙা আলো কতদূর থেকে আসছে। নিয়মমতো অঙ্ক পেতে উত্তর বেরল—'৯,৩০,০০,০০০' মাইল। অঙ্কনবীশ বার বার পরখ করে মাথা চুলকে ভাবতে লাগল, "তাইতো, কষার ভুল পাচ্ছিনে, অথচ গণনার একি অদ্ভুত ফল।" সামনের বনটা তো মাইল কতকের বেশি দূর হতেই পারে না। তার ধাঁধা লাগা দেখে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বন্ধু আশ্বাস দিলেন—"ওহে, উত্তর ভালোই পেয়েছ। রামধনু যাকে বলে সে তো মেঘ থেকে ঠিকরে-আসা সূর্যকিরণ বই অন্য কিছু নয়। ওর দিকে মুখ করলে সূর্য থাকে পিছনে, সেই কথা বিপরীতের মাইনাস্ চিহ্ন (−) জানিয়ে দিচ্ছে। আর সূর্য ৯, ৩০, ০০, ০০০ মাইল দূরে তো বটেই।"

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা হিমসিম খেলেও, যন্ত্রের সাহায্যে বুদ্ধি খাটিয়ে যা পান, তার বর্ণনা করায় তাঁরা এমন পোক্ত যে, যার ইচ্ছে সে যাচিয়ে নিতে পারে। তাই রকমারি ঈশার চেহারা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একবার দেখে নেওয়া যাক, পরে তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলে সমন্বয়ের উপায় বেরিয়ে পড়তে পারে। শিক্ষানবীশকে এইটুকু সতর্ক করে দেওয়া দরকার, উপলব্ধি হবার আগেই বড়ো বড়ো জ্ঞানের কথা আওড়ালে চৈতন্য জাগার সাহায্য হয় না, উলটে তাকে ভুলিয়ে অসাড় করে রাখা হয়।

পুরাকালে, যখন পৃথিবী সবে সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে প্রচণ্ডতাপে বাষ্পময় ছিল, তখনকার অবস্থায় আমরা এখন যাকে প্রাণের ক্রিয়া বলি, তার উপায় ছিল না। কালক্রমে ঠাণ্ডা হবার পর যখন জীবনরূপী জলের কতক অংশ তরল হয়ে আকাশ থেকে নেমে এসে মাটির খাঁজে-খন্দে বসে গেল, তার মধ্যে প্রাণীকণা উদ্ভাবন হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। এই প্রাণ জিনিসটায় ঈশার প্রকাশ প্রথম ফুটে ওঠে, যার দরুন জড়ের নিরুদ্দেশ গতির মধ্যে একটা মতি দেখা দেয়।

প্রাণশক্তির মতি অনুসারে দৈবাৎ এক আধটা নয়, দল-কে-দল প্রাণবিন্দুরা দেহ গড়তে লেগে গেল। প্রাণকোষটা ভাঁজ হয়ে পেটের খোঁদল হল, আগা পাকিয়ে ছ্যাজ বেরল, ছ্যাজের ঝাপটায় উদর পূরণের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেল। খেয়ে দেয়ে দেহ বেশি বেড়ে গেলে দু'টুকরো হয়ে বংশবৃদ্ধি হতে লাগল, ক্রমে যুগলমিলনের কৌশল বেরিয়ে, সন্তানের মধ্যে বৈচিত্র্য এসে উন্নতির পথ খুলে গেল।

প্রাণশক্তির কথা না এনে ফেললে চলে না। যে খাবার সামনে নেই, যে ভাবী উন্নতি আগে থাকতে কল্পনায় আসতে পারে না, তার খোঁজে প্রাণীকণাকে পাঠালে কে।—যদি বল ভিতরকার অন্ধ সংস্কারের এই কাজ, তবে প্রশ্ন ওঠে গোড়ায় সে সংস্কার এল কোত্থেকে। যদি বল এক ঈশায় সবই করাচ্ছেন, তাহলে প্রাণীতে জড়ে, প্রাণীতে প্রাণীতে কাটা-কাটি মারামারির হিসেব পাওয়া যায় না। কাজেই আপাতত প্রাণশক্তি ব'লে কোনো খণ্ড-ঈশার প্রভাবে প্রাণক্রিয়া চলে, তাই ধরতে হয়।

আবার দেখো, প্রবাহের মধ্যে যেমন প্রবাহ, ঈশার উপর তেমনি ঈশা। প্রাণীকণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণশক্তির উপর জৈবিক শক্তির আবির্ভাব হয়, তার প্রভাবে প্রাণীকণাদের মধ্যে সমবেত হয়ে বড়ো কলেবর ধারণ করার চেষ্টা দেখা যায়।

প্রথম দিকে জীব দেহ-ধারণের চেষ্টার এক দৃষ্টান্ত স্পঞ্জ জাতি, যে স্পঞ্জের সমাজদেহের খোলসকে ইংরেজরা গামছার মতো ব্যবহার করে। এই ফোঁপরা-ছিবড়ের মতো জিনিসটা সমুদ্রতলার একজাতের প্রাণীকণা সমবায়ের তৈরি বাস-পল্লী। সুড়ঙ্গের মতো যে সব গর্ত ওর মধ্যে দেখা যায়, তারি ধারে ধারে মাথা গুঁজে ল্যাজের দিক ফাঁকায় রেখে, প্রাণীকণারা স্থাবর হয়ে থাকে,—ভিটে কামড়ে যেমন পাড়াগেঁয়ে মানুষ থাকতে চায়, তার চেয়েও কায়েম হয়ে। এ অবস্থায় তারা আলাদা হয়ে খাবার খোঁজে বেড়াতে পারে না, কিন্তু সবাই মিলে একতালে ল্যাজ নেড়ে তারা এই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে জলের স্রোত চালাতে থাকে। জীবদেহে রসরক্ত চলাচলের আভাস এখানে পাওয়া যায়। স্রোতের সঙ্গে যা-কিছু পুষ্টিকর জিনিস ভেসে আসে, যে-যার জায়গায় আটকে থাকলেও তার ভাগ সকলে পায়।

এই যে মিলেমিশে সমুদ্রের মধ্যেকার মালমসলা জুটিয়ে সুরঙ্গময় বাসস্থান তৈরি করা, একসঙ্গে তালে তালে ল্যাজ নাড়া, প্রত্যেকের আলাদা প্রাণশক্তি সকলকে ঠিক একভাবে এসব কেমন করে শেখাতে পারে। তাই আবার প্রাণীদলের উপরকার জৈবিক শক্তির প্রভাব মানতে হয়।

স্পঞ্জের মতো ঢিলে-ঢালা সমবায় দিয়ে আরম্ভ করে, প্রাণীকণারা এক একদল বর্ণভেদ কর্মভেদ স্বীকার করে নানা অঙ্গবিশিষ্ট আঁটসাঁট জীবদেহ গড়তে শিখে উঠল। সেই সঙ্গে দলাদলির সূত্রপাত হল, খাদ্যখাদক সম্বন্ধ উৎকট হয়ে উঠল।

ঢেউয়ের আধার সমুদ্রকে আমরা 'এক' বলি, কিন্তু ঢেউগুলি একটি আর একটিকে কখনো বাড়ায়, কখনো চাপা দেয়, ঠোকাঠুকি লাগলে দুটোই ভেঙে পড়ে, তাই দেখে তাদিকে 'আলাদা' বলি। আবার

এরোপ্লেন থেকে সমুদ্রে-ঢেউয়ে একাকার মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি উদারদৃষ্টিতে বড়ো ঈশার সঙ্গে ছোটো ছোটো ঈশার যোগাযোগ ধরা পড়তে পারে। সেই আশায় খণ্ডশক্তিগুলোর ক্রিয়াকলাপ আরো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

একদল প্রাণীকণা সূর্যকিরণের তেজ শরীরের মধ্যে আটকে নিয়ে তার সাহায্যে সোজাসুজি জড়কণা দিয়ে প্রাণের ক্রিয়া চালাবার উপায় পেয়ে গেল। এরা উদ্ভিদশ্রেণীতে ফলাও হল। আর যে প্রাণীকণার দল তা করতে পারল না, তারা উদ্ভিদ খেয়ে তাদের তৈরি কোষ দিয়ে প্রাণক্রিয়া চালিয়ে নানা শাখার উদ্ভিদ-খেকো শ্রেণী বার করল।

গোড়ায় গোড়ায় উদ্ভিদজাত সবই শেওলার মতো নরম ছিল, তখন তারা জলের তলায় বা ধারে শিকড় গাড়ত। ক্রমে তাদের কোনো কোনো দল শক্ত ছালের ঢাকা বানিয়ে, তার ভিতরে নিরাপদে রস চলাচলের ব্যবস্থা রেখে, ডাঙায় উঠে পড়ল, শেষে বিচি ছড়াবার নানা ফন্দি বার ক'রে পাহাড়ের মাথায় পর্যন্ত চড়ে গেল। উদ্ভিদ-খেকোরাও গায়ে শক্ত চামড়া মুড়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ছেয়ে ফেলল। এদের মোটামুটি দুই শাখা,—পোকার মতো যাদের নরম দেহ, আর হাড়ের কাঠামো থাকায় যাদের দেহ শক্ত। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রশাখা আরো সোজায় পুষ্টি আদায় করার চেষ্টায়, উদ্ভিদ খাওয়া ছেড়ে স্বশ্রেণীর পশুপাখি মাছপোকা খেতে লাগল।

তবু, এত রকমের খাওয়া-খাওয়ি সত্ত্বেও জন্তুতে পাখিতে গাছে পোকায় পরস্পর সাহায্যেরও কিছু কিছু সম্বন্ধ রয়ে গেল; তার কিছু আভাস আমরা আগে পেয়েছি।

এতেও ঈশার বৈজ্ঞানিক পরিচয়ের শেষ নয়। জৈবিক শক্তি যেমন নানা রকম প্রাণীকণার সমবায় বেঁধে জীবদেহ তৈরি করে চালায়,

তেমনি আরো উপরকার এক শক্তি, যাকে সংঘশক্তি বলা যেতে পারে, সে জীবদের মধ্যে গুণকর্ম বিভাগ করে সমাজের মতো আরো বড়ো কলেবর রচনা করায়। এই সংঘশক্তির ক্রিয়াকলাপ অল্পের মধ্যে বুঝতে হলে পোকার ছোটো ছোটো সমাজের উপর নজর করলে সুবিধে হবে।

সমাজ-বাঁধা পোকার মধ্যে উই, মৌমাছি, পিঁপড়ে, এরাই প্রসিদ্ধ।

একদল প্রাণকোষে মিলে যেমন এক একটি উইপোকা গড়েছে, তেমনি একদল উইপোকা মিলে মাটির ছাল-ঢাকা সমাজ-কলেবর রচেছে, যাকে বলে উইঢিবি। সেই ঢিবি-গারদের অন্ধকারে নিজত্ব-হারা উইপোকারা যে রকমের জীবন কাটায়, তাতে ওদের সংঘশক্তিকে তামসিক বলতে হয়।

জন্তুর চামড়া কেটে গেলে যেমন জৈবিক শক্তির হুকুমে রসরক্তের দৌড়োদৌড়ির চোটে জায়গাটা ফুলে ওঠে, রক্ত জমাট বেঁধে বাইরের খারাপ জিনিস কিছু ঢুকতে দেয় না, ভিতরে নানা কোষের ক্রিয়ায় নতুন চামড়া তৈরি হয়, তেমনি উইঢিবির মাটির ছাল কোথাও ভেঙে গেলে, সেখানে লাল সাদা দু'রকমের উইপোকা ছুটে আসে, লালগুলি বাইরের পোকামাকড় ঠেকিয়ে রাখে, সাদাগুলি ভিজে এঁটেল মাটির ছোটো ছোটো ডেলা এনে ছাল মেরামতে লেগে যায়।

এখানেই সংঘশক্তি নিজেকে জানান দেয়। ভাঙা মাটির ফাঁকের দু'দিক থেকে জোড়ার কাজ চলে, শেষে ঠিক এক থামালে জোড় মিলে যায়। তবে কি এই চোখ-কান হীন সামান্য পোকারা নিজের মধ্যে এরকম জটিল কাজের বিষয়ে পরামর্শ করতে পারে। এক বিজ্ঞানী সে কথা পরীক্ষা করার জন্যে একটা ঢিবিকে করাত দিয়ে এ-পার ও-পার ফেড়ে কাটার ফাঁক দিয়ে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত একটা টিনের চাদর চালিয়ে দিলেন, যার মধ্যে দিয়ে একদিক থেকে অন্যদিকে কোনো রকম

আদানপ্রদান চলতে পারে না। তবু দেখা গেল উইকর্মীরা দুদিক থেকে মেরামতের কাজ আরম্ভ করে ঠিক এক থামালে টিনের দুপাশে ফাঁকটা জুড়ে দিলে। কোনো উপরের সংঘশক্তির নির্দেশ ছাড়া এমন তো হয় না।

এই সংঘশক্তির প্রভাবে উইঢিবির জীবনযাত্রার যত রকম কাজ চলে—মাটির তৈরি সুড়ঙ্গ বেয়ে লিঙ্গহীন কর্মীদের কাঠের সন্ধানে বেরনো, কাঠের গুঁড়ো কেটে এনে গরম স্যাৎসেতে গুদমে পুরে, ছাতা ধরিয়ে তাকে হজম করানো, সেই তৈরি "ফুড" খাইয়ে ডিম ফোটা বাচ্ছাদিকে বড়ো করা, উপরের মাটি শুকিয়ে গেলে জলের কাছ পর্যন্ত নেমে গিয়ে ভিজে মাটি তুলে আনা, আরো কত কী।

জন্তুর মাথা কাটা গেলে যেমন তার শরীরের যত রকমের কোষ সব নির্জীব হয়ে মারা যায়, তেমনি উইপোকাদের সংঘশক্তি ওদের মাতৃ-স্থানীয় একটি বিশেষ স্ত্রীপোকার মধ্যে দিয়ে কাজ করে। সেটি পেট-সর্বস্ব একটি ডিমপাড়া যন্ত্র বললেও হয়, ঢিবির নিভৃত স্থানে একটি আলাদা ঘরে বন্ধ থেকে সে জীবন-ভর ডিমই পাড়ে। বাচ্ছাদের মতো তাকেও কর্মীরা খাওয়ায়, সেবা করে। তাকে যদি মেরে বা সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলে উইপোকাদের নিত্যকর্ম বন্ধ হয়ে যায়, তারা একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, ঢিবির আয়ু শেষ হয়ে যায়।

ঢিবির বংশবৃদ্ধি উপলক্ষ্যে পোকাদের বৎসরে একবার ডানা গজায়, বিয়ের উৎসবের দিন সেই একবার এরা খোলা আলো হাওয়ার স্বাদ পায়। কিন্তু হায় কপাল, সে কি অদ্ভুত উৎসব। ভোজ পড়ে যায় রাজ্যের লোভাহূত গির্‌গিটি টিক্‌টিকি বাদুড় চাম্‌চিকের দলের, আর তরকারি হয় হতভাগা বর ক'নেরা স্বয়ং। শেষে যে দু'চারটি টি'কে যায়, তারা জোড় বেঁধে ডানা খসিয়ে নতুন ঢিবি পত্তন করতে বসে বটে,

কিন্তু সে পরিণামের উদ্দেশ্যে যে-সংঘশক্তি মরবার তরে ঝাঁকে ঝাঁকে উইপিপীলিকাদিকে পক্ষ জোগায়, তাকে অন্তত মিতাচারী বলা যায় না।

ঈশার এক খণ্ড পথ হারিয়ে অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে, ঢিবি জীবনের চেহারাটা সেইরকম নয় কি।

মৌমাছিদের সংঘশক্তি রাজসিক, চাকের মধুময় আঁধার থেকে প্রফুল্ল কাননের জেল্লায় এঁদের আনাগোনা। চাকের বাসিন্দারা হচ্ছে—একটি পাটরানী, গুটিকতক বাচ্ছা রানী, দশবিশটা পুরুষ-মোসাহেব, আর বাকি সব লিঙ্গহীন কর্মী। আকাশমার্গে বিবাহ-উৎসবের মাতামাতির পর থিতিয়ে বসলে, পাটরানীর কাজ হচ্ছে চাকের ঘরে ঘরে ডিম পেড়ে বেড়ানো। চাকের বাসিন্দা বেড়ে উঠলে, বাচ্ছা রানীরাও সেই সঙ্গে সাবালিকা হয়ে এক এক ঝাঁক কর্মী নিয়ে স্থানান্তরে নতুন চাক ফাঁদতে বেরিয়ে পড়ে, এই ভার তাদের উপর। আর কর্মীরা একনিষ্ঠায় চাকের যত কিছু কাজ সব করতে থাকে—মোম তৈরি থেকে আরম্ভ করে, মোম দিয়ে চাক গড়া, রানীদের সেবা, ডিম-ফোটা বাচ্ছাদের খাওয়ানো, রোদের বেলায় মধু এনে ভাঁড়ারে রাখা, শত্রুর আক্রমণ ঠেকানো, রাতে সকলে মিলে একসঙ্গে ডানা নেড়ে চাকের হাওয়া বদলানো, বাচ্ছাদের মধ্যে কারা রানী হবে, কারা পুরুষ হবে, কারা কর্মী থাকবে, রেণুতে মধুতে মিশিয়ে সে রকম খাবার ব্যবস্থা করা,—এমন অশেষ কাজে খাটতে খাটতে এদের অল্প আয়ুর কটা দিনের মধ্যে শরীর জীর্ণ হয়ে যায়।

কর্মীদের এত খাটুনির উৎসাহ কি মধুর রসে মাতোয়ারা হওয়ার লোভে?—তা তো নয়।—যেটুকু মধু খায় এক তো তার চেয়ে ঢের বেশি তুলে রাখে, তাছাড়া রানীকে বাচ্ছাকে না খাইয়ে ওরা তো খায়ই

না। যত খাতির রানীর, যত সেবা বাচ্ছাদের, যত কঠোরতা হতভাগা পুরুষগুলোর ভাগ্যে ; বসন্ত-উৎসবে একজন উদ্‌যোগী পুরুষ তো রানীকে লাভ করে, বাকি সব ঘরে ফিরে এসে বেকার বসে থাকে, ফুলের মসুর্ম উতরে গেলে কর্মীরা তাদিকে ঘেরাও করে মেরে দেয়—মধুর বাজে খরচ ওদের এতই অসহ্য। নিজেদের সম্বন্ধে কর্মীরা উদাসীন, কেউ কারো অপেক্ষা রাখে না, কোনো কর্মীর আঘাত লেগে সে যদি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, তার দিকেও অন্যেরা ফিরে তাকায় না, চাকের কাজের হুড়োহুড়িতে তাকে যদি মাড়িয়ে যেতে হয়, সেও স্বীকার।

নিজের বেলা এত হেলা, পরের কাউকে আতুপুতু, কাউকে মারধর,—এ ব্যাপারের হিসেবটা এই যে, এরা বোঝে শুধু "বৃদ্ধি", স্বজাতবৃদ্ধি—মানুষের মধ্যে যেমন ক্ষত্রিয়-বৈশ্যপ্রবর নিজের সুখস্বচ্ছন্দ তুচ্ছ করে রাজ্য বাড়াতে, ধন বাড়াতে, মশগুল থাকে। শেষে এতদিনের গৃহস্থালি, এত করে সঞ্চয় করা মিষ্টিধন, ওদের এই যথাসর্বস্বের মায়া কাটিয়ে নিজেদের কোন্ এক অতীত অহেতুক-বৃদ্ধিবাতিকগ্রস্ত সংঘশক্তির এক ইশারায় অর্বাচীন রানীর অনুচর হয়ে ওদের তরুণ দল অজানার মধ্যে অকাতরে ঝাঁপ দেয়। ঝড় জল দুর্যোগের হাত থেকে যারা বেঁচে যায়, তারা পৌঁছয় কোথায়? না, আবার নিজেকে ভুলে নতুন চাক তৈরি করা, আবার তৈরি চাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। ব্যক্তির উৎকর্ষ-সাধন গোছের কোনো বালাই নেই।

এক রকম তপস্বীদলের আস্তানা দেখা যায়, সেখানে বোকাগৃহস্থদের খাটুনির দান মাটির তলায় কাঁড়ি হতে থাকে, বুড়ো তাপসরা সরে পড়ার আগে একদল শিষ্যকে সেই তপস্যা শিখিয়ে যায়, যাতে করে পুতে রাখা ভিক্ষের ধন আরো বাড়তে থাকে, যা দেবতার উপকারে

লাগে কিনা জানা নেই, ধর্মের কাজে যে লাগে না সেটুকু নিশ্চয়। এই রকম তপস্বীদের দেখলে মৌচাকের কথা মনে পড়ে।

সে যাই হোক, মৌমাছি-জীবনের ঘানি যে-ঈশায় ঘোরায় তার আরো বড়ো কিছুর দিকে এগোবার রাস্তা দেখা যায় না। তবে পাশ্চাত্ত্য মানুষের চালাকির সঙ্গে পারা ভার। মৌমাছির আপন-ভোলা শ্রমকে সে নিজের ভোগে লাগাবার ফিকির বার করেছে। "বংশ বাড়াবি, সাধ হয়েছে?—বেশ তো, তার জন্যে গাছের গর্ত খুঁজে ঘুরে মরা কেন। দিব্যি কাঠের বাক্স তৈরি আছে, তাতে ব'সে যা, চাকে প্রাণ ভরে মধু আন্, ঝাঁকের পর ঝাঁক বার করতে চাস্ কোনো ভয় নেই, বাক্স মোজুদ আছে।" এই অভ্যর্থনায় খুশি হয়ে মৌমাছি বশ মেনে গেল, এক এক বাক্সে লাখো কর্মী জুটে আধমন একমন করে মধু জড়ো হতে লাগল, সে মধু কৌশল করে মানুষে বেমালুম বার করে নিয়ে তার বদলে গুড় ভরে দিলেও ঘানিঠেলা মদেমত্ত মধুকর দলের সে দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। এদিক থেকে দেখলে, মানুষের সঙ্গে বড়ো সমবায়ভুক্ত হওয়াটা মৌমাছির ভাগ্যে ঘটেছে বটে।

পিঁপড়েদের জীবন বিচিত্র, সন্দেহ নেই। ওদের সংঘশক্তিকে সাত্ত্বিক বলা না যাক, চৌকস বলা চলে। ওদের শস্য ফলানো আছে, গো[১] পালন আছে, সন্ধিবিগ্রহ আছে, বাচ্ছাদের প্রাণপণ যত্ন তো আছেই, তা ছাড়া শরণাপন্নকে আশ্রয় দেওয়া আছে, পরস্পরকে দান করাকরি আছে, এমন কি ওদের মধ্যে দাতাকর্ণের দল আছে যারা মিষ্টি

১ আমরা যে জীবকে গোরু বলি, তা অবশ্য পিঁপড়েরা পালন করে না। এক জাতের ছোটো পোকা আছে যারা গাছের মিষ্টিরস খেয়ে টৈটুম্বুর হয়ে থাকে, পিঁপড়েরা যত্ন করে তাদিকে কাছাকাছি বসায়, তাদের গায়ে শুঁড় বুলিয়ে খোশামোদ করে সে রসবিন্দু আদায় করে নেয়।

রসের বোঝা নিয়ে বসে থাকে, যে চায় তাকে বিলোয়। দেহ নেহাত খুদে না হলে, ওরা হয়তো মানুষের সঙ্গে সমানে টক্কর দিত।

নাবিকেরা এক দ্বীপের গল্প করে, যেখানে ডেঞ্চে পিঁপড়ের দল এমন আড্ডা গেড়েছিল যে, সেখানে অন্য কোনো জানোয়ার থাকার যো ছিল না; তারা দ্বীপ দেখবে বলে যেমন নৌকো থেকে নেমেছে, আর পিঁপড়ের দলবদ্ধ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পালাতে পথ পায় না। ক বছর পর আর একবার সেখানে খবর নিতে গিয়ে সেই নাবিকেরা দেখে যে ইতিমধ্যে এক প্লাবনে পিঁপড়েরা উজাড় হয়ে গেছে, মানুষ সমেত নানা জন্তুর বসবাস শুরু হয়েছে।

পিঁপড়েরা যে, সংঘশক্তির জোরে চলে-ফেরে, তার একটা প্রমাণ বললেই হবে। বাঘ-সিংহকে আলাদা করে খাঁচায় রাখলে. দুটি দুটি খাবার যোগালে, তারা আয়ুর শেষ পর্যন্ত তাতেই টিঁকে থাকতে পারে। কিন্তু দুটি একটি পিঁপড়েকে প্রচুর খাবার দিয়েও আলাদা করে রাখলে তারা বাঁচে না।

পোকাসমাজের একটু একটু যা ছবি দেখা গেল, তা থেকে কিছু তত্ত্ব উদ্ধার করা যায় কি, যা আমাদের এ পালায় কাজে লাগতে পারে।

এক তো বোঝা যাচ্ছে যে, খালি আমি-হারা হলেই বড়ো হবার দরজা খুলে যায় না। দেবীর উপর অভিমান করে কবি জিজ্ঞাসা করেছেন, "কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসারগারদে থাকি, বল্?" সে বিলাপের উত্তর এই—গৃহস্থ যদি গতানুগতিকের গোলাম হয়ে চলে, নিজের পায়ে নিজেই শিকল পরায়, তবেই তার সংসারটা আশ্রম না হয়ে গারদে দাঁড়ায়। যেটা ভবের লীলা হবার কথা, তাই হয় ভব-যন্ত্রণা। হিন্দু যখন স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি খেলানো ছেড়ে দিল, তখন থেকে চোখের জলে তারাকে ডাকতে ডাকতে তার দিন কাটছে, বিধাতার

কাছে রোজ-কে রোজ পাঁচ মোহর পারিতোষিক[১] আদায় করে আনন্দ করা মায়া-পাগলের ভাগ্যে ঘটে না। মনে পড়ে কবি ইকবালের উপদেশ—“আমিকে হারানো দূরে থাক্, তাকে এমন টনটনে চৈতন্যে তুলতে হবে যাতে সে বিশ্বকে নিজের ভিতর টেনে নিতে পারে।”

আর একটা দেখা যাচ্ছে এই,—সংঘশক্তি যতবার সংস্কারবদ্ধ জীবকে সমবায়ে মিলিয়ে বড়ো করতে গেছে, ততবারই তাদিকে ঘূর্ণিপাকে ফেলে নিজেও তার মধ্যে আটকে গিয়ে, ত্রাণের চেষ্টায় ভঙ্গ দিতে হয়েছে। এখন ঈশার যা কিছু আশাভরসা মানুষের মতো মানুষ নিয়ে কারবার ক'রে।

মানুষ দুই ধারার মধ্যিখানে এসে পড়েছে। বুদ্ধি-খাটানো ছেড়ে দিয়ে সে বাপদাদার আমলের ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে চোখবাঁধা বলদগিরিও করে থাকে, আবার নিজের নিত্যনতুন সৃষ্টির আনন্দে আলো হতে আরো আলোয় উড়ে বেড়াতেও পারে। তার লক্ষীনারায়ণ লাভের তিন যুগের ব্যর্থ চেষ্টার কথা তো বলা হয়েছে,—এবার বা মানুষের ঈশার গুণপনার শেষ পরীক্ষা—কল্কি অবতার USS-Rকে দিয়ে তিনকেলে বাজে সংস্কারের জাল ঝেড়ে ফেলে যদি লক্ষীনারায়ণের উপযুক্ত আসন পেতে রাখতে পারে। নইলে অস্ত্রঝন্‌ঝনানির আওয়াজে মানুষ দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে, বর্বর অবস্থায় দৌড়ে ফিরে যাবে। পাকা ঘুঁটিকে কেঁচে গাদ থেকে আবার বেরোতে হবে।

পুরোনো আবর্জনা বিদায়ের কথা যদি তোলা গেল, তবে একটা বিধান নেওয়া দরকার।

পুরাকালে উৎপেতো অসুরের জ্বালায় অস্থির হলে দেবতারা বাঁচাও, বাঁচাও! বলে চণ্ডীদেবীকে কাকুতিমিনতি করতেন। এ কালের

১ পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দানকে সাধক রবিদাস এই ভাবে নিতেন।

নেতারা যাঁকে ডাকেন, চতুরা-রূপে অ-সহযোগ সাজেই আসুন, আর নিজ-মূর্তিতে রণসজ্জায়ই আসুন, তিনি সেই চণ্ডীই বটেন, রেহাই দেবার পাত্র তিনি নন। কোনো না কোনো ভাবে তাঁর আবির্ভাব না হলে প্রকৃতির গলতিই হোক, আর মানুষের বদমায়শিই হোক, তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় দেখা যায় না।

তাই জিজ্ঞেস করি, যে শত্রুরা কখনো লুকিয়েচুরিয়ে কখনো বা হাঁক-ডাক করে, মাঝে মাঝে সমীকরণ যজ্ঞবেদি নষ্ট করতে আসে, তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষত্রতেজ প্রকাশ করে যজ্ঞ রক্ষার চেষ্টার দরুন USSR-কে আদর্শভ্রষ্ট পাষণ্ড বলে গাল পাড়া চলে কি।

মানুষের সঙ্গে মানুষের কালক্রমে রফারফি হলেও হতে পারে; গোছগাছের ছিকমতে মানুষ হয়তো বা নির্বিবাদে পরস্পর-উপকারী জীবজন্তু গাছপালা দিয়ে ক্রমশ নিজেকে ঘেরাও করে রাখতে পারবে; কিন্তু হিংসাকে কি একেবারে বাদ দিতে পারা যাবে। অন্তত ধুলো থেকে, জল থেকে, হাওয়া থেকে, কলেরা-ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড-ইনফ্লুয়েঞ্জার যত রোগবীজকে মেরে সারা না করলে, "মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ···মধুমৎ পার্থিবংরজঃ···" এই মন্ত্র দিয়ে মানুষ নিজের সংঘশক্তির প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা জানাতে পারবে না।

শত্রুমিত্রের নিন্দেপ্রশংসার বাড়াবাড়ির কুয়াশা ভেদ করে পরের পালায় USSR-এর মনের ভাবের কতকগুলি স্ন্যাপ্‌শট্‌ ছবি নেবার চেষ্টা করা যাবে।

চতুর্থ পালা

প্রবাসী-গ্রামবাসী সংবাদ

মহাভাঙন তন্ত্র

বিপ্লবের প্রথম পঞ্চবার্ষিক সংকল্পে চাষাদের উপর হাত পড়েনি। শ্রমিকদের মধ্যে ওরাই সবচেয়ে অবুঝ, সবচেয়ে পুরোনোর গোঁড়া। তা ছাড়া, তখনো বাইরের শত্রুর আক্রমণ পুরোদমে চলেছে। এ অবস্থায় দেশসুদ্ধ লোককে ঘাঁটালে সামলানো মুশকিল হত।

১৯৩০ সালের গোড়ায় বিপ্লবীকর্তারা সময় বুঝে উপদেশ জারি করলেন, "এখন চাষাকেও বিপ্লবের মধ্যে নিজের স্থান ঠিক করে নিতে হবে, তাই এবারকার পঞ্চবার্ষিক সংকল্প শেষ না হতেই, বাপপিতামহের ধারা ছেড়ে, নিজের জমিবাড়ি, নিজের গোরুভেড়ার মায়া কাটিয়ে গ্রাম-সমবায়ের (kolhoxy) মধ্যে তাদের আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক।"

কর্তাদের বিধান অনুসারে, এই সমবায়ই গ্রামের সব কাজ চালাবে। একসঙ্গে গুছিয়ে কলের সাহায্যে চাষবাস পশুপালন করলে আগের চেয়ে ফল অনেক বেশি পাওয়ার কথা, তাই দিয়ে সমবায়ীদের জীবন-যাত্রা ভালোমতে চালিয়েও যা বাঁচবে সেটা দেশের অভাব পূরণের জন্যে কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে। তাতে পল্লীবাসীরও অবস্থার উন্নতি হবে, রাষ্ট্রমধ্যে অসাম্য ক্রমে আর থাকবে না।

সমবায়ভুক্ত হতে যাদের নেহাতই মন সরবে না, তাদের উপর জবরদস্তি করার হুকুম হয়নি ; তারা নিজেদের পরিবার পালনের জন্যে একটি গোরু বা ঘোড়া, গুটিকতক ছাগল ভেড়া বা শুয়োর রাখতে পারার ব্যবস্থা হল। কিন্তু সমাজে তাদের মানমর্যাদা থাকবে না, সমবায়ভাণ্ডারে সস্তায় কেনার অধিকার তারা পাবে না ; তা ছাড়া, এ

ভাবে রাখা সম্পত্তির মূল্য অনুসারে তাদিকে একলসেঁড়ে টেক্স দিতে হবে।

কিন্তু পরের মেহনতে নিজের দরকারের অতিরিক্ত চাষআবাদ করিয়ে, বা পশু রেখে, বা কারবার চালিয়ে বিনাশ্রমে আরামের চেষ্টা একেবারেই মানা। এটা অপরাধের মধ্যে গণ্য। এরকম কুধনী (koolack) ধরা পড়লে, তার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে তাকে নির্ধনী (de-koolackise) করে দিয়ে, যেখানে নতুন আবাদ করা হচ্ছে সেখানে তাকে সপরিবারে মজুরি করতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মরিস হিণ্ডাস (Maurice Hindus) একজন নামজাদা লেখক। তাঁর জন্ম রুশের এক গণ্ডগ্রামে। ১৪।১৫ বছর বয়সে ঘরবাড়ি ছেড়ে তিনি মার্কিন দেশে গিয়ে বসবাস করেন ; সেখানেই কৃতী হন। কিন্তু দেশের উপর তাঁর টান যায়নি, তার সব খবর তিনি রাখতেন।

বিপ্লব শুরু হলে, এই প্রবাসী জন্মভূমিতে বেড়াতে এসে বুঝতে পেরেছিলেন যে, রুশের মাটির সঙ্গে চিরকাল লেপ্টে আছে যে-চাষী, এ মহা নাটকে তাকেই প্রধান পাত্র হতে হবে, যদিও তখনো ভূমির স্বত্বাধিকার নিয়ে আইনের টানাটানি পড়েনি। পরে মার্কিন দেশে ফিরে গিয়ে তিনি যখন বিপ্লবীকর্তাদের মহাভাঙন তন্ত্র—স্টালিন নাম দিয়েছিলেন দি গ্রেট ব্রেক (The Great Break) প্রচারের সংবাদ পেলেন, তাঁর মন বড়োই খারাপ হয়ে গেল।

এই নিরীহ কৃষক জাতের উপর ইতিহাসের কী সাংঘাতিক ধাক্কাটাই এসে পড়ল। এক ঠেলায় সেকাল থেকে একালে লাফিয়ে আসা, রাজশক্তির আশ্রয় ছেড়ে আত্মশক্তির উপর এসে পড়া, সম্রাট-আমলের শত-অত্যাচার সহ্য করেও যে বাস্তুটুকু জমিটুকু আগলে এসেছে, অবশেষে সে সব অনভ্যস্ত সমবায়ের হাতে ইচ্ছে-সুখে সঁপে দেওয়া—

এ বড়ো ভীষণ ফরমাশ। সকলের বাড়া এই, যে গৃহস্থ রাতদিন জমি-জমার ভাবনা ভেবে, তিলে তিলে পলে পলে সম্পত্তি বাড়িয়ে মুরুব্বি হয়ে উঠেছে, এখন তার এই যথাসর্বস্ব না ছাড়লে তাকে কিনা পেতে হবে সাজা।

প্রবাসীর মনের ব্যথা আমরাও বুঝি। ধনীর ধন জালিয়াতে ফাঁকতালে মেরে নিলে তাকে সশ্রম নির্বাসন-দণ্ড দেওয়া হয়, তা তো গা সওয়া হয়ে গেছে। অন্যের খাটুনির ফল ভোগ করে ধনী গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়, তাও দেখে দেখে আর বিসদৃশ লাগে না। কিন্তু ধনী বেচারীকে জালিয়াতের মেকদারের সাজা পেতে হবে শুনলে মনটা ছ্যাঁক করে ওঠে বইকি।

পৃথিবীর কোনো জাতকে কোনো কালে কি এত বড়ো সর্বনাশের মুখে পড়তে হয়েছে। এ কথা প্রবাসী মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবছেন, এমন সময় তিনি নদিয়া (Nadya) নামের একটি পরিচিত রুশমেয়ের চিঠি পেলেন—

নদিয়ার চিঠি

আমাদের দল-বল নিয়ে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরতে চলেছি,—চাষীদের সমবায় পত্তন করতে। কাজটা সহজ নয়, কিন্তু ফলটা বিরাট। তুমি এখানে চলে এসো ; যে চাষীদের প্রকৃতি তুমি অচল অটল মনে কর, তারা কেমন করে সমবায়ী হতে শিখছে, দেখবে এসো। চোখে দেখলে, ওদের দুঃখ কল্পনা করে তোমায় আর দুঃখ পেতে হবে না, তোমার নিজেরও চিত্তশোধন হবে। তুমি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলে—প্রাণ যাবে তবু চাষায় বাস্তু ছাড়বে না ; সেই একগুঁয়ে চাষীকে আমরা কেমন করে পথে আনছি, দেখে যাও। শুধু দেখেই বা ক্ষান্ত হবে কেন।

রুশকে নতুন ভিতের উপর খাড়া করার কাজে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। এখানকার হাওয়ায় আগুন লেগেছে,—নতুন ভাবের, অভাবনীয় উদ্যমের আগুন।—

এই নদিয়া একটি বেঁটেখাটো মেয়ে, ঝাঁকড়া কটা চুল, বড়ো বড়ো কটা চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে, গোলগাল মুখ, সু-ছাঁদের ঠোঁট, মিষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ গলার স্বর, মন-কাড়া হাসি। আত্মশক্তির উপর তার অগাধ বিশ্বাস। ১৯ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়, কিন্তু স্বামী তাকে বিপ্লবের ধান্দায় জড়াতে দিতে চায় না বলে, সে সংকল্প ত্যাগ না করে ত্যাগ করল স্বামীকে। এখন সে অসীম আনন্দ-উচ্ছ্বাসে USSR-এর নববিধান প্রচারে মেতে আছে।

নদিয়াকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—"এ কাজে তুমি কি সুখ পাচ্ছ" —সে হেসে ওঠে, কিংবা রাগ করে। ব্যক্তিগত সুখ বলে জিনিসটাই সে মানে না। তাকে যাতে খেপিয়ে বেড়াচ্ছে, সে সুখের সন্ধান নয়। মহাযুদ্ধে সামান্য সৈনিকের মতো সে এই বিরাট যজ্ঞে আত্মনিবেদিতা। যে শরীর পাত করতে বসেছে, তার আবার আলাদা সুখদুঃখ কিসের। যজ্ঞের প্রগতিতেই তার সুগতি।

নদিয়া একা নয়। আজকের রুশে এমন হাজার মেয়ে আছে, তাদের হাজার ভাইও আছে, যারা সমীকরণ যজ্ঞ পূর্ণ করার মহাব্রত সাধনে প্রাণ পণ করেছে।

নদিয়ার ডাকে সেই প্রবাসী জন্মভূমিতে ফিরে এলেন,—বিপ্লবের ধারা নিজের চোখে দেখতে। তিনি যা দেখলেন শুনলেন, কতক তাঁর নিজের জবানিতে, কতক তাঁর টুঁকে-নেওয়া পাঁচ জনের মুখের কথায়, এ পালায় ধরে দেওয়া যাচ্ছে।

অর্বাচীনের কথা

বিকেলবেলা রেলস্টশনে নেমে, আমার ছেলেবেলাকার খেলাঘর সেই গণ্ডগ্রামের রাস্তায় হেঁটে চললাম। যে ধারে যাই, মেঘমুক্ত রোদে ভরা আকাশের মনোহর নীলে চোখ জুড়োয়। মনে হল লার্ক[১] পাখির এমন আপনহারা গান আর কখনো শুনিনি। চারিদিকে কোথাও হেলাফেলার চিহ্ন নেই, ফসলে ফসলে মাঠ উথলে উঠছে, ভাবী আশার উৎসবে সবই উৎফুল্ল।

আমি প্রাণ ভরে দেখতে শুনতে চলেছি, এমন সময় গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে এক স্কুলের ছেলের সঙ্গে দেখা। বয়স বছর বারো হবে। চাষার রীতি অনুসারে সে কাঁধে-ফেলা লাঠির আগায় জুতো জোড়া টাঙিয়ে খালি পায়ে চলেছে, মাথার ছাঁটা চুলের উপর টুপিও নেই। বগলে একঝুলি বই। সে বুঝি সমবায়ের লাইব্রেরির জন্য শহরে বই আনতে গিয়েছিল, এখন বাড়ি ফিরছে।

আমি প্রবাসী বলে নিজের পরিচয় দিয়ে, ওর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম—বাড়ির কথা, গ্রামের কথা, গ্রাম-সমবায়ের কথা, যার মধ্যে এই বছরের গোড়ায় ওর বাপ ভর্তি হয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "বড়ো হলে তোমার কী হতে ইচ্ছে যায়?"

সে বললে, "ইঞ্জিনীয়ার হব।"

"বিশেষ ক'রে ইঞ্জিনীয়ার কেন।"

"গ্রামের গোলাবাড়ি, সাঁকো, কারখানা, যা কিছু দরকার বানিয়ে দেব।"

"তুমিও তাতে বেশ ধনী হয়ে উঠবে, না?"

ছেলেটা হেসে উঠল।

---

১ লার্ক পাখি আকাশে উড়তে উড়তে গায়।

"হাসছ কেন।"

"বোকা ছাড়া ধনী হতে কে চায়। তাই হাসছি।" পরে সে গম্ভীরভাবে বললে, "ধনী হওয়া মানে পরকে লুঠ করা।"

"কিন্তু ভালো ভালো জিনিস তোমার নিজের হয়, তাও কি চাও না? তোমাকে কেউ যদি ঘোড়া কি মোটরগাড়ি দেয়, তা কি নাও না।"

"নিই বইকি, নিয়ে বাবার সমবায়ে দিয়ে দিই। জানেন, প্রবাসী মশায়, আজকাল ধনী কথাটা আমরা গুদামজাত করেছি, ওটা আর চলতি নেই।"

আমি অবাক হয়ে ছোকরার পানে তাকিয়ে রইলাম। এতটুকু মুখে অত বড়ো কথা। একি ওর সত্যিকার মনের ভাব, না শেখানো বুলি। কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে বলে গেল, চোখের ভাবে মুখের কথায় গরমিল তো দেখলাম না, মুখস্থ গৎ আওড়াবার মতো চেহারা মোটেই নয়। আমি যে-দেশ থেকে এসেছি, সেখানকার ছেলেরা বলা দূরে থাক্ এ কথা ভাবতেই পারে না; সেখানে এ ধরনের মতামত নেহাতই ফাঁকা শোনাত; তাই প্রথমটা সন্দেহ হয়েছিল।

রাস্তার মোড়ে ছেলেটির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। আমাদের বাড়ি যে পাড়ায় ছিল, নানা কথা ভাবতে ভাবতে সেদিকে চলতে লাগলাম।

এখন দেশে যে-দ্বন্দ্ব চলেছে, তা রাস্তার দুই পাশের মাঠের চেহারা থেকেই বোঝা যায়। এক দিকে সমবায়ের হাত পড়েছে, আল দিয়ে খেত ভাগ করা নেই, কলে বোনা বিচির গাছের সোজা সোজা লাইন জমির ঢাল ধরে যেন ফসলের স্রোতের মতো বিল পর্যন্ত চলেছে। অপর ধারে, যারা সমবায়ভুক্ত হয়নি, তাদের ভাগ করা ছোটো ছোটো খেতে ফসলের সে তেজ নেই, তারা যেন বিরুদ্ধ ভাবের জের টেনে রেখেছে মাত্র। এ বৎসরের গোড়ায় যে "সমবায়" এত ভয়ভাবনা ওজর-

আপত্তির বিষয় ছিল, এরি মধ্যে তার প্রভাব, প্রকৃতির ঋতুপরিবর্তনের মতো বেমালুম এসে গ্রামকে ছেয়ে ফেলেছে।

মনে সন্দেহ রইল না, ভবিষ্যতে আর যাই হোক, রুশের সেই নিরিবিলি ঝিমন্ত পল্লীর দিন ফুরিয়েছে। আমাদের এই গ্রামে আজও কারখানা দেখা দেয়নি; যেদিন কলের বাঁশি গ্রামবাসীর মন কেড়ে নেবে, সেদিন যা থাকে অদৃষ্টে, তারা নতুনের মধ্যে ঝাঁপ না দিয়ে পারবে না।

এই স্কুলের ছেলেটি বড়ো হলে, বিপ্লবের নতুন আঁচ নরম পড়ে গেলে, তখনো যদি এই নিজস্ব ধ্যানে বিতৃষ্ণার ভাব, পরের অভাবমোচনে আগ্রহের ভাব, দেশে সজীব থাকে, তাহলে USSR বাস্তবিকই পৃথিবীর যত রাজ্যকেই বল, যত ধর্ম সম্প্রদায়কেই বল, একটা নতুন আদর্শ দেখিয়ে দেবেন।

আমরাও তাহলে প্রবাসীর কথায় নিজের ভাবে সায় দিয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, USSR নীলকণ্ঠের মতো বিষয়ের বিষ টেনে নিয়ে, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার মন্ত্রে সমীকরণ যজ্ঞ সফল ক'রে কলির ক্ষয় করে এনেছেন।

গ্রামের কথা

সূর্য অস্ত যায় যায়, কিন্তু এখনো বেশ আলো আছে। তবু গ্রামে ঢুকতেই যেন প্রকৃতির প্রফুল্ল ভাবের উপর একটা ছায়া পড়ল। রাস্তার দুধারের বাড়িগুলোয় অযত্নের নানা লক্ষণ নজরে ঠেকল,—বেড়া উঠন, ঘরদোর সবই কেমন বেমেরামত। ট্রিনিটি[১]র উৎসব এল বলে, কিন্তু আমাদের ছেলেবেলার সে সাজসজ্জা কই। কোনো চালে নতুন খড় ওঠেনি, কোনো দরজায় নতুন রং পড়েনি।

১ Trinity ইহাদের সেকেলে নবান্ন গোছের উৎসবের খ্রীস্টান সংস্করণ।

বুঝলাম, সমবায় নিয়ে দোটানা ভাবের এই মূর্তি। পাছে অবশেষে সমবায়ে না গিয়ে উপায় থাকবে না মনে করে কেউ হাতে রেখে খরচ করছে, কেউ বা সমবায়ে যোগ দিয়েছে, কিন্তু ভালো মনে দিতে পারেনি বলে পরের কাজ ভেবে হাত সরছে না।

গ্রামে এখন আমাদের জ্ঞাতি আর নেই। আমার চোদ্দপুরুষ এখানেই জন্মেছে, মরেছে, বংশের শিকড় গেড়েছে, কিন্তু এ আমলে আমরা সে শিকড় উপড়ে দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছি। আমার এখন নতুন জীবন, নতুন মন, নতুন আকাঙ্ক্ষা ; তবু মনে হচ্ছে এ গ্রামের সকলেই আমার আপনার। মাঠ, জলা, জঙ্গল, কোথায় কী ছিল, সবই আমার মনে গাঁথা আছে। সেখানে সাথীদের সঙ্গে কত খেলেছি, বনের ফল, পাখির ডিম কত পেড়েছি, পালক কুড়িয়ে এনে যে-যার মাকে বালিশ তোশক করতে দিয়েছি।

কিন্তু এ কী। বিলের ধারের জঙ্গলটায় তো কিছু ছিল না,—আজ সেখানে মস্ত একটা বাড়ি দেখছি। কাছে গিয়ে দেখি এটা নতুন তৈরি স্কুল বাড়ি, সাদা রঙের দরজা জানালা, উপরে লেখা বড়ো বড়ো অক্ষরের নামটা আমার দিকে প্যাট প্যাট করে চেয়ে না থাকলে বিশ্বাসই হত না।

আমার ছেলেবেলায় এখানকার চাষারা লেখাপড়ার ধার ধারত না। তাদের চিঠিপত্র লিখে পড়ে দিয়ে আমি ঝুড়ি ঝুড়ি আপেল ফল দক্ষিণে পেয়েছি। মনে পড়ে, একবার জাপান যুদ্ধের সময় একজন বিদেশী এসে পুরোনো খবরের কাগজ থেকে যুদ্ধের কথা শুনিয়ে দু'চার বস্তা বাজরা আদায় করে নিয়ে গেল।

এখন স্কুলের ছুটি। কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখি একধারের ঘরে সার

সার খাট পড়েছে, তার উপরে ধবধবে বিছানা পাতা। শুনলাম, চাষা গিন্নিরা সমবায়ের কাজে বেরলে, এটা তাদের ছেলে রেখে যাবার জায়গা। ছেলেরা বেশ খুশি মনে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমায় দেখে দাই এগিয়ে এসে অনেক গল্প করলে। হাসতে হাসতে বললে, প্রথম প্রথম ভারি আপত্তি উঠেছিল, ছেলেদিকে চাষী-প্রথামতো ঘোলে ভেজানো বাজরার রুটি না খাইয়ে খাঁটি দুধের উপর শুখিয়ে রাখা হচ্ছে।

আমার কাছে কিন্তু বড়ো হাসির কথা নয়। মনে পড়ে গেল ছেলে-বেলার আদরিয়া (Adarya) গিন্নির কথা। তেরো বছরে তার তেরোটি ছেলে হয়ে সবক'টি মারা যায়। অখাদ্য কাকে বলে, নোংরা কিসে হয় কিসে যায়, না জানার এই দুর্দশা। বেচারীর কাঁদতে কাঁদতেই জীবন কেটেছিল।

স্কুলবাড়ি ছাড়িয়ে আর একটু যেতে, ঠিক যেখানটায় আমাদের বাড়ি ছিল, সেখানে দেখি সাজসরঞ্জাম সমেত একটা দমকল ঘর। এ রকম সব খোড়ো চালের গ্রামে আগুন-লাগা কী সর্বনেশে কাণ্ড মনে করলে এখনো বুক কাঁপে। জলের যোগাড় নেই, একসঙ্গে চলাবলার অভ্যেস নেই; যে জল আছে এলোমেলো আপসাআপসীর চোটে তাও পৌঁছয় না; কেউবা বাধা দিয়ে বলে, দেবতার কোপ জলে শান্ত হবে না, দুধ চাই; ফলে, আগুন ঘরের পর ঘর গ্রাস করছে, হাতপা এলিয়ে তাই দেখতে হত।

আমাদের আমলে বছরে বছরে কত শত গ্রামে এই বুকফাটা ঘটনার আবৃত্তি চলত। শেষে ঘরপোড়া চাষাগুলো এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আবার বাড়ি করার কাঠখড় আনতে বেরত। এখন তাহলে তারো উপায় হয়েছে।

এবার চেনালোকের পাড়ায় এসে পড়েছি। চারিদিক থেকে—"এসো, এসো, একটু বসে যাও, একপাত্র দুধ খেয়ে নাও",—সমাদরের ডাকাডাকি চলল। তাদের অনুরোধ এড়িয়ে শেষে ছেলেবেলার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে উঠলাম। আমাকে পেয়ে স্বামীস্ত্রী দুজনেই মহা খুশি, তাড়াতাড়ি নিজের নিজের কাজ সেরে নিয়ে দুধ পনীর ডিমহালুয়া সাজিয়ে খেতে বসিয়ে দিলে। সেখানেই রাত কাটালাম।

গ্রাম্য বৈঠক

পরদিন রবিবার, সকলেরই ছুটি। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি প্রবাসী ফিরে আসার খবরে অনেকে আমায় দেখতে আসছে, তাছাড়া ছুটি বলেও রাস্তায় লোকের আনাগোনা বেশি। কামারের বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গাটায় কাটা গাছের গুঁড়ির উপর আমরা সব আড্ডা করে বসলাম।

সমবায়ে সব কিছু দিয়ে থুয়ে যে নিঃস্ব (Bedniak) হয়েছে, বিপ্লবী-হিসেবমতো সেই মান্যগণ্য ; যে অসমবায়ী গৃহস্থ নিজে আলাদা খাটে খায় (Seredniak) সে মাঝামাঝি ; যে পরকে খাটিয়ে নিজে আলস্যের আরামে থাকার চেষ্টা করে সে হয় কুধনী (koolack)। কিন্তু গ্রাম-সমাজে এসব শ্রেণীভেদের চিহ্ন দেখা গেল না ; এখানে মাত্র দুই দল—যারা সমবায়ের পক্ষপাতী, আর যারা সমবায়ের বিরোধী।

মার্কিন দেশের গল্প শোনাবার জন্যে আমায় সবাই ধরে বসল।

আমি কিন্তু সে আবদার কাটিয়ে বললাম, "না, সে হবে না। আমি তোমাদের কথা শুনতে এসেছি, তোমরাই সব বলো।" সব দলের লোক আছে দেখলাম—যার যা মতামত জেনে নেবার এমন সুযোগ ছাড়ি কেন।

একটা বুড়ো চাষা আরম্ভ করে দিলে—"একটা জিনিস আমরা খুব শিখেছি—গোরু ঘোড়া ভেড়া আর বাড়ানো নয়।"

বুঝলাম, এটা রাগের কথা। যেটুকু না দিলেই নয়, তার বেশি সমবায়ের হাতে দেওয়া হবে না, তাতে দেশের অভাব বাড়ে বাড়ুক,—বিরোধী পক্ষের এই ভাব। যারা এসেছে তাদের মধ্যে কর্তৃপক্ষের লোকও রয়েছে, তবু কেউ ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয়।

আর এক চাষা বলে চলল, "এই দেখো না, সেদিন আমার বাড়ি পেয়াদা চড়াও হল। দোষের মধ্যে আমার একটা তিন-কাল-যাওয়া বিচিলি কাটার কল আছে, তা দিয়ে বছরে সামান্য কিছু রোজগার করে থাকি, তাই দেখে আমাকে কুধনী সাব্যস্ত করার চেষ্টা। আমি হেসে বললাম—লোভ হয়ে থাকে, লোহার দামে তোমরা ওটা নিয়ে নাও—তবে পেয়াদা থামল। কিন্তু তাতেও পার নেই।—তোমার গোরু কটি? আমি বললাম—একটি। দেখিয়ে দাও।—নিয়ে চললাম গোয়ালে। দুটি দেখছি যে।—ওটি তো বাছুর। পেটে বাচ্ছা, বাছুর কেমন?—বাচ্ছা পেটে থাকলে তো গাই হয় না, বাচ্ছা আগে হোক। এই বলে আমি গিন্নিকে ডাক দিলাম। সে এসে এমনি তুড়ে দিলে যে পেয়াদা পালাতে পথ পায় না।"

সকলে। এই তো গিন্নি বলি।

সৈনিকের মতো ঢ্যাঙা লোককে একজন ডেকে বললে, "এই যে নিকোলাই, বলো না হে, কর্তারা তোমাকে কী নাকালটা করেছিল।"

নিকোলাই। থাক্ না, সে সব পুরানো কথা খুঁচিয়ে তুলে কী হবে।

সকলে। না, না, বলে ফেলো। আমাদের মার্কিন অতিথি সব জানতে চায়।

নিকোলাই। আমি গোড়াতেই ভেবেছিলাম, সমবায়ভুক্ত হব; কিন্তু গিন্নি বেঁকে বসল, বললে তাহলে গলায় দড়ি দেবে, তাই হল না। শেষে আমার সব কেড়ে কুড়ে নিলে, রাখার মধ্যে মন কতক খাবার দানা আর দুচার বস্তা আলু রেখে গেল। এখন সমবায়ে ঢুকে নির্বাসন থেকে বেঁচেছি।

এইটুকু বলে নিকোলাই সরে পড়ল।

এক বুড়ো। আমাদের নিকোলাইর মতো হিসিবি মানুষ আর দেখা যেত না। রোদ ঝড় জল যাই হোক না কেন সে সমানে রোজগারের ফিকিরে ঘুরে বেড়াত। বিচিলির গাড়ি থেকে দু'এক গাছ পড়ে গেলে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনত। আলু তোলার সময় কাঁচা পচা কিছু বাকি রাখত না। আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই, শহরে কাজে গেলে শখ করে ময়দার রুটিটুকু মুখে দিত না। এত করে জমানো ধন এ রকম বেঘোরে মেরে নেবে, কে জানত।

অন্য গ্রামের এক সমবায়ী-যুবক এ কথা শুনে আলোচনায় যোগ দিলে।

যুবক। এত করার যে কথা বলছ, এত করে লাভটা হত কার। আশপাশে যারা আধপেটা খেয়ে আছে তাদিকে কি খাওয়াত। নিজেও খেল না, মলে সঙ্গেও যাবে না, তবে কিসের জন্যে জমাল। তার চেয়ে মানুষের মতো থাকলে হত না? তোমাদের নিকোলাইকে চিনিনে, কিন্তু আমাদের গ্রামের কামারটা ঐ রকম ছিল। সে মরার পর ঘর থেকে, গুদম থেকে, চালের ভিতর থেকে কী যে না বেরল, বেশির ভাগ ফেলে দিতে হল। সকলে জানত তার মোহর-ভরা বাক্স আছে। খোঁজ, খোঁজ, কোথাও পাওয়া যায় না, শেষটা পায়খানার তলার মাটি খুঁড়ে বেরল। কী যাচ্ছেতাই জীবন।

বুড়ো। তোমাদের মতো লক্ষ্মীছাড়া নিঃস্ব হয়ে ঘুরে বেড়ানো সব চেয়ে ভালো—না ?

যুবক। ভালো নয় তো কী। আমরা ভালো খাই পরি, পরস্পরের সুখদুখের ভাগ নিই, পরদেশেরও খবর রাখি, মানুষের জীবন কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তে করি, সেই মতো চলে বেঁচে সুখ পাই।

অনেকে। ঐ সমবায়ের গোঁড়া আসছে। এসো মাসী। তুমি তো সমবায়কে স্বর্গ মনে কর। প্রবাসী ভায়াকে সব বলো না।

মাসী। হাঁ, ঘণ্টা-নাড়ার স্বর্গ বটে। ঘণ্টায় ওঠো, ঘণ্টায় খাটো, ঘণ্টায় খাও, ঘণ্টায় শোও—ঘণ্টা না পড়লে মা-হারা পাখিছানার মতো চিঁ চিঁ করতে থাকো।

এক রসিক। মাসী দেখছি বাজনাবাদ্যি ভালোবাসে না।

সকলে হেসে উঠল।

মাসী। সত্যি কথা, ঘণ্টার বাজনায় নেচে বেড়াতে ভালোবাসিনে। পরশু দিন কাজে মন লাগল না, চৌপরদিন পড়ে ঘুমোলাম। কাল খিধে হল, পাঁচ বার খেলাম। সমবায়ে থাকলে আমার জন্যে পাঁচ বার ঘণ্টা পড়ত ?

সকলে। সাবাস, মাসী, সাবাস।

সমবায়ী যুবক। যখন ফসল কাটা হবে, তোমরা ভালো খাও, কি আমরা ভালো খাই দেখা যাবে।

বুড়ো। ভারি তো বাহাদুরি। দেশের যত ভালো জমি ঘোড়া গোরু তোমাদের সমবায় নিয়ে বসে আছে। কাঠ চাও, কলের লাঙল চাও, টাকা হাওলাত চাও, সদর থেকে তখনি যুগিয়ে দিচ্ছে। আমরা

অমন স্থবিধে পেলে তোমাদের চেয়ে অনেক কারদানি দেখাতে পারতাম।

একজন মোটাসোটা গ্রামবাসী এগিয়ে এল,—"নিঃস্ব কাকে বলে জানতে চাও তো আমায় দেখো। আগেও নিঃস্ব এখনো তাই। তবে আগে পাঁচ সাত মুদ্রা যোগাড় করে টেক্সটুকু দিতে পারলেই চুকে যেত, আর জ্বালাতন করত না। কুকুরটা পর্যন্ত বাড়ি ঢুকতে পেত না। এখন টেক্স লাগে না বটে, যা দরকার তাও পাই, কিন্তু খানাতল্লাশের জ্বালায় প্রাণ যায়। আর কেটে নেয় কত—বাড়ির বিমা, ফসলের বিমা, এর পর বলবে হাত-পা'র বিমা।"

এক শ্রোতা। আরে ভাই, বিমা কি খারাপ জিনিস।

নিঃস্ব। খারাপ কে বলছে। কিন্তু আমার খাটুনির দাম থেকে কাটবে কেন। নিঃস্ব বলে কি আস্ত আস্ত মুদ্রা কাটা গেলে মায়া লাগে না।

আবার হাসি পড়ে গেল।

প্রথম শ্রোতা। খুচরো অস্থবিধের কথা ছেড়ে দাও। আমি বলি গোড়ায় গলদ। দেখো প্রবাসী ভায়া, তুমি তো জান একই পরিবারের মধ্যে লোকে গালাগালি চুলোচুলি না করে থাকতে পারে না; আর এই পরকে নিয়ে সমবায় করা, এতে ঝগড়াঝাঁটি হাতাহাতি লাগবে না? কিছুদিনের মেয়াদ হলেও হত, এ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

দ্বিতীয় শ্রোতা। যা বলেছ ভাই। খাওয়াপরা ঠিক থাকলেই তো হয় না, নিজের ইচ্ছেমতো ফসল লাগালাম, ইচ্ছেমতো খাটলাম কি বসে রইলাম, জমালাম কি খরচ করলাম,—এ না হলে কি সংসার করা বলে। আমরা তো জেলখানায় আছি,—যা বলবে তাই করো, যা দেবে তাই খাও, পরের ভাবনা ভেবে মরো।

তৃতীয় ব্যক্তি। দেবার অবিচার কেমন, তাও দেখো। এক গিন্নির দশ ছেলে সে দশ মাপ দুধ পাবে, আর যে বেচারীর একটি ছেলে সে এক মাপের বেশি পাবে না।

বুড়ো। আমাদের সরে পড়বার সময় হয়েছে। গলায় দড়ি দিয়ে সংসার থেকে বিদায় নিলে তবে বাঁচব। এখন হয়েছে ছোঁড়াদের রাজত্ব।

আমি বুঝলাম, বুড়ো বিপ্লবের ঝাঁকানি খেয়েছে, কিন্তু তার ভাবটা মাথায় থিতিয়ে বসাতে পারেনি। পুরোনো ছাড়লে সামনে দেখে অতল গহ্বর, তরাসেই হয় সারা। জিজ্ঞেস করলাম,— "সমবায়ভুক্ত করার জন্যে কি জবরদস্তি লাগিয়েছে।"

সকলে। না, না, তা নয়। আগে পেড়াপিড়ি চলত বটে, কিন্তু কর্তার মহা ভাঙনের উপদেশ বেরবার পর সে সব আর হয় না।

এক ব্যক্তি। হয় না বলছ কী করে। সমবায়ে যোগ না দিলে ঘ্যানর-ঘ্যানরের চোটে কি সোয়াস্তি থাকে। অত্যোচারও আছে বই কি। সেদিন, মনে নেই, ঐ পোল (Pole) পাড়া থেকে ভরা-শীতে মেয়ে-ছেলে-সুদ্ধ কতজনকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে উত্তরে খাটতে পাঠিয়ে দিলে। বাপ রে, সে কী কান্নাকাটি।

যুবক। ওরা তো সব কুধনী।

বুড়ো। ভালো এক কুধনী কথা শিখেছ। ধনীদের কি রক্তমাংসের শরীর নয়,— ওদের ছেলেপিলে শীতে মারা পড়লে আমাদের গায়ে লাগে না?

যুবক। কালস্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে দুঃখ তো ডেকে আনা হয়। ক'টি স্ত্রীলোক-বালকের খাতিরে বিপ্লব আটকে থাকতে পারে না। আগেকার আমলের বিকট অত্যোচারের কথা তোমরা ভুলেই যাচ্ছ।

তার জন্যে যদি সম্রাট আমলা জমিদার পাদ্রী সবই সরাতে হল, তবে কুধনীর শেষ রাখলেই বা চলবে কেন। বিপ্লব আমাদের পিঠে হাত বুলোতে আসেনি, মানুষ করতে এসেছে। কর্মীরা দেবতা নয় সে তো জানা কথা,—মানলাম মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে বসে; কিন্তু ধরা পড়লে উপর থেকে সাজা তো পায়।

এমন সময় এসে পড়ল ফিটফাট পোশাক বুট-জুতো-পরা সদরের প্রচারক, গ্রামে গ্রামে যারা সমবায় পত্তন করে বেড়াচ্ছে, তাদের এক জন। ওকে দেখে সকলে একটু শশব্যস্ত হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু বিরক্ত হল না, ভালোভাবেই আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আরম্ভ করে দিলে—"কী গো। নাকে কান্না হচ্ছিল বুঝি। বেশ, বেশ, প্রাণ ভরে কাঁদুনি গাও। দেখুন, প্রবাসী মশায়, এরা সব শিশু; দিনে খুব করে কেঁদে না নিলে রাতে ভালো ঘুম হয় না।

"শোনো হে, হতভাগা অসমবায়ী যারা আছ। আমার কথাগুলো একটু মন দিয়ে শুনে যাও। বলি, তোমরা কী সুখে টুকরো টুকরো জমিগুলো এখনো ধরে আছ। এই মার্কিন ভদ্রলোকের সামনেই বিচার হোক, ইনিও শুনুন। বছরে বছরে বুড়োরা সরে যাচ্ছে, রেখে যাচ্ছে অনেক ছেলে, জমির ভাগ ছোটো থেকে আরো ছোটো হতে চলেছে। আলে আলে কত জমি খেয়ে যায় সেটা হিসেবে আন কি। আর আজকাল হল কলের যুগ, আল থাকলে কলের লাঙলের সুবিধে পাও না। পুরোনোর মায়া কাটাতে পারছ না, শেষটা কি আমার, আমার বলে বাড়ি আঁকড়ে না খেয়ে মরবে।

এক শ্রোতা। আপনাদের সমবায় আসার আগে কি খেতে পেতাম না।

প্রচারক। কেন বাজে কথা বল, বাপু। তোমাদের সে খাওয়া কি খাওয়া ছিল,—না আধমরা থাকাকে বাঁচা বলে। দশ বিশ বছর পরে কী হবে সেটা ভাবা তো তোমাদের ধর্মে নেই, নইলে বুঝতে দেশের ছেলেদের উন্নতির জন্যে কী রকম আয়োজন চলেছে। তোমরা যে কত বোকা সেটুকু বুঝলেও কাজ হয়। এই কবছর আগে যখন ও-গ্রামের জমিদার-বাড়ি ভাঙা হল, তখন তোমাদের স্কুল-তৈরির জন্যে মালমশলা দিতে চেয়েছিল,—বয়ে আনতে হবে বলে তোমরা নিলে না। পরে তো চাঁদা তুলে সেই স্কুল করতে হল, তাও কি সোজায়,—চাঁদার টাকা আদায়ই হয় না। স্কুল হয়ে খুশি হওনি, এখন বুকে হাত দিয়ে বলতে পার? সমবায়ের কোন্ কাজটা অন্যায় হয়েছে বলো তো দেখি। দমকল করে দিয়েছে, জলাগুলোর উপর সাঁকো বসিয়েছে, সমবায়ে যোগ দিলে কত সস্তায় জিনিসপত্র পাও—

দ্বিতীয় শ্রোতা। রেখে দিন আপনার সমবায়, সমবায়ের কথা আলাদা—

প্রচারক। আলাদা তো বটেই। যেমন-কে-তেমনি থাকলে আজও সম্রাটের আমলার ঠেলার মজা বুঝতে, সেসব দিনের যন্ত্রণা তো হজম করে বসে আছ। আসল ব্যাপার কী তা বুঝেছি। ফাঁক তালে ধনী হবার লোভ ছাড়তে পারছ না। কিন্তু খবরদার। সে পথে গেলে মরবে। ও মায়া পুষে রেখো না। কর্তারা কুধনীর ওষুধ জানে, তা তো দেখতেই পেয়েছ। ধরা পড়লে ছাড়নছোড়নের আশা কোরো না। প্রবাসী মশায় নতুন এসেছেন, তোমাদের ফোঁপানিতে তিনি ভুলতে পারেন, আমরা ভুলব না। তোমরা ইচ্ছে কর, আর নাই

কর, তোমাদের সকলকে সমবায়ী শ্রমিক করে মানুষ করব তবে ছাড়ব.।

বেলা হয়ে এল, মজলিশ ভেঙে গেল, আমরা যে-যার বাড়ি চলে এলাম।

জমিদার-রাখালের কথা

ইহুদী জমিদার ইব্রাহিম-দাদাকে আমার বেশ মনে ছিল। লম্বা শরীর, চোস্ত চেহারা, ফিটফাট পোশাক, হাসিখুশি মানুষ। ইহুদীদের অবশ্য জমিদারি-স্বত্ব পাওয়ার অধিকার ছিল না, তবে তিনি ছিলেন বড়ো জোতদার, ব্যবসাদারও বটে। প্রদেশের মধ্যে তার গোরুর পাল বিখ্যাত। রাস্তা থেকে একটু ভিতরের দিকে তাঁর সুন্দর সাজানো বাড়ি ফুলবাগান, ফলবাগান সমেত বেশ পরিপাটি।

আমরা যখন গ্রামে ছিলাম, এ পাড়ায় এলে ইব্রাহিম-দাদা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে চা[১] খেয়ে যেতেন, সে সূত্রে আমাদের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বও হয়েছিল। বিপ্লবের পর তাঁর আর খোঁজ রাখতে পারিনি। এখন শুনলাম তিনি সমবায়ভুক্ত হয়ে বাড়িতেই আছেন।

কথাটা একটু আশ্চর্য লাগল কারণ সমবায় হল চাষীদের, জমিদার বা জোতদারদের তাতে কেমন করে স্থান হতে পারে। তবে সম্রাটের আমলে ইহুদীদের উপর অমানুষিক উপদ্রব হয়েছিল বলে বিপ্লবের পর তারা অনেক বিষয়ে আসন পেয়েছে শোনা যায়। শুনলাম ইব্রাহিম নাকি সমবায়ের গোরুর পালের খবরদারি করার ভার পেয়েছেন।

---

১ রুশ-গৃহস্থদের বাড়িতে সারাদিন স্যামোভার-এ চা চড়ানো থাকে। কেউ দেখা করতে এলে এক গেলাস গরম চা দুধ চিনি দিয়ে নয়, নেবুর রস দিয়ে তৈরি করে আতিথ্য করা রীতি।

আগেকার দিনে কাউকে রাখাল বললে গাল দেওয়া হত,— আজকাল অবশ্য ওটা সম্মানের পদ। তবু সেই শৌখীন-প্রাণ ভদ্রলোক রাখাল-গিরি করছেন,— কেমন খাপছাড়া ঠেকল। ভাবলাম যাই, দেখে আসি।

বাড়ির হাতায় ঢুকেই তফাত বুঝতে দেরি হল না। একি সেই বাড়ি। কোথা সে চেকনাই, কোথায় সে ফুলের বাহার। বাগানের বেড়া ভাঙা, রাস্তায় আগাছা ঠেলে উঠেছে, সর্বসুদ্ধ পোড়ো চেহারা। এখন ঘরে ঘরে অনেক সমবায়ী পরিবারকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, তাদের ছেলেপিলেরা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে; গাছে গাছে দড়ি টাঙানো, তার উপর সকলের কাপড় শুখোচ্ছে।

"ইব্রাহিম কোথায়?"—জিজ্ঞেস করায় একটি ছোটো মেয়ে বললে তিনি মাঠে গোরু চরাচ্ছেন।

বিলের ধারে মাঠে গিয়ে দেখি, ঘাসের উপর ইব্রাহিমদাদা ব'সে, হাতে গোরু খেদাবার চাবুক। চেহারার সে চাকচিক্য আর নেই, অনেক দিন দাড়ি কামানো হয়নি, পাজামা গুটোনো, খালি পা, বেশ একটু বুড়িয়ে গেছেন। সামনে এক পাল গোরু আরামে ঘাস খাচ্ছে।

প্রথমটা ইব্রাহিম আমায় চিনতে পারেননি, নাম বলতে খুশি হয়ে উঠলেন; তখন মুখে আগেকার জেল্লা কতক ফিরে এল। তাঁর পাশে ঘাসের উপর বসে তাঁকে আমার দেশে আসার কারণ জানিয়ে দিলে পর তিনি নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলেন, "বুড়ো হয়ে গেছি, না? কিন্তু যত দেখাচ্ছে তত নয়। বুড়ো বয়সের উপযুক্ত হালকা কাজও পেয়েছি। এই দেখো আমার হাতিয়ার। সেনানায়কের যেমন তলোয়ার, আজ এরও তেমনি মহিমা।" ব'লে তাঁর হাতের চাবুকটা

আমার সামনে তুলে ধরলেন।—"মার্কিন-দেশে যখন ফিরে যাবে, তোমার মাকে যদি বল আমায় রাখাল করে দিয়েছে, তিনি হয়তো কেঁদেই ফেলবেন। তোমরা আমায় কত বড়ো লোক ঠাওড়াতে মনে আছে?" বলে ইব্রাহিম হেসে উঠলেন।

প্রথমটা সন্দেহ হল, বুঝি কাষ্ঠহাসি। কিন্তু কই, না গলার স্বরে, না চোখের চাউনিতে, খেদের লক্ষণ কিছুই দেখলাম না। বেশ সহজ প্রশান্তভাবে তিনি বলে চললেন,— "মাকে বুঝিয়ে ব'লো, কাঁদবার কিছু নেই,—সুখেরই কথা। আমি নিজে, কাঁদা দূরে থাক্‌, যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝছি যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। বিপ্লবের মধ্যিখানে বাস করলে কত রকম প্রশ্ন মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে,—আগেকার দিনে সেসব কথা তুললে বলতে পাগল। হতে পারে আমরা সকলে পাগলই হয়েছি। আবার এও হতে পারে, আগেই ছিলাম পাগল এখন সহজ মানুষ হয়েছি। আমায় তোমার খুব অদ্ভুত লাগছে,—না?"

"ও কথা কেন বলছেন, দাদা?" আমি আপত্তি করে উঠলাম।

"তুমি যে-দেশ থেকে আসছ, সেখানকার লোকের কাছে আমাদের এসব ব্যাপার কত অদ্ভুত ঠেকে, তা জানি, তাই কথাটা মনে হল, ভাই।"

ইতিমধ্যে এক গোরু দল ছেড়ে ফসল-খেতে গিয়ে পড়ল। তাই দেখে, ইব্রাহিম লাফ দিয়ে উঠে, তার পিছন পিছন ছুটে, চাবুকের ফটাস্‌ ফটাস্‌ আওয়াজে তাকে ঘুরিয়ে আনলেন। মুখের ঘাম মুছে আবার এসে বসতে, তাঁর অনেকখানি বয়স যেন ঝরে গেল। নিজের কাহিনী তিনি আবার বলে যেতে লাগলেন,— "আমাদের সমবায়ে এক বুড়ো চাষা আছে সে লেখাপড়া জানে না বটে, কিন্তু বুদ্ধি

টনটনে। আমায় সমবায়ভুক্ত হতে দেখে সে আহ্লাদে আটখানা। হাতে ধরে বললে— বেশ করেছ ভাই। টঙে চড়ে বসে থাকনি, আমাদের দলে নেমে এসেছ, তোমার সুবুদ্ধির উপযুক্ত হয়েছে। একলসেঁড়েপনায় লাভটা কী। প্রতিবাসী যে জিনিসের নাগাল পায় না, তা একা ভোগ করে কি সত্যিকার তৃপ্তি হয়।

"সেকালে এ প্রশ্ন শুনলে হেসে উড়িয়ে দিতাম ; এখন তা পারি না, নিজের মনেই সে কথা দিনরাত উঠছে। এই কথাই তোমাকে বলবার আছে। আমাকে সমীকরণপন্থী কি অরাজকপন্থী, কি কোনো একটা পন্থী মনে ভেবো না। আমি যে কী তা নিজেই জানিনে, জানার দরকারও দেখিনে। মোট কথা পুরোনোর জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে বেঁচেছি, আগের ভাব এখন মনে করলে লজ্জা হয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার স্ত্রী, ছেলেরা,—তাঁদের ভাব কী।"

"ছেলেরা তো অনেক দিন থেকে বিপ্লবের পক্ষে। স্ত্রীও আস্তে আস্তে মন ঘুরিয়ে আনছেন। ইহুদী ব'লে আমরা অনেক বিষয়ে রেহাই পেতাম, তবু জোতদার থাকতে এ টেক্স সে টেক্স দিতে শাঁস ক্রমশই কমে আসছিল। অন্যদিকে যে প্রশ্নের কথা তোমায় বললাম, মনের মধ্যে তাও খেলছিল—আমরা খাব মাংস মাখন পনীর সাদা ময়দার রুটি, আর আশপাশের মানুষের জুটবে খালি শাকসবজির ঝোল দিয়ে বাজরার কালো রুটি, এটা কি ঠিক।

"বুঝলাম, ঐহিক পারত্রিক দুদিকের ঠেলায় দু-নৌকোয় পা দিয়ে থাকা চলে না। গত শরৎকালে একদিন পরিবারের সকলকে ডেকে পরামর্শে বসলাম। আমি বললাম—দেখো এভাবে থাকা পোষাচ্ছে না ; এসো, পুরোনোর মায়া কাটিয়ে নতুনকে ধরা যাক।

"রাত ভোর বকাবকি, চোখের জল ফেলাফেলি চলল; শেষে সকলের মন খোলসা হয়ে গেল, পরস্পরের প্রতি আড় ভাব রইল না। সবাই মিলে স্থির করলাম—ভালো মনে সমবায়ী হব। শুধু জমি কেন, বাড়িঘর জানোয়ার আসবাবপত্র, নিজের বলে আর কিছুই রাখব না, সত্যিকার নিঃস্ব হয়ে বলব—যা করে সমবায়।

"এ রকম কাজ আধা-খেঁচ্ড়া করা কিছু নয়, ইস্পার নয় উস্পার! তাই আমরা খালি হাতে পরিষ্কার মনে সমবায়ে যোগ দিলাম।

"সবই সুখের হয়েছে, তা মিথ্যে করে বলব কেন। সমবায়ের হাত এখনো পাকেনি, কিছু ঢিলেমি আছে, কিছু বা নষ্টামি, অনেক গলতি আছে যেগুলো মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। আগেকার মতো ভালো খেতে পরতে পাই, তাও নয়। দেখছ তো খালি পায়ে আছি, জুতো বাঁচিয়ে না চললে শীতকালে করব কী।

"কিন্তু দুঃখের কথাই বা এমন কী আছে। এই পুরোনো বাড়ির দুটি ঘরে আমাদিগকে থাকতে দিয়েছে। দুধ রুটি যথেষ্ট দেয়, মাঝে মাঝে ডিম পাই, হপ্তায় একদিন মাংস,—পুষ্টির কম্‌তি নেই।

"আসল লাভ হয়েছে কী জান? হৃদয়ের খিল খুলে গেছে, মনের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। আমার সেই একার বাড়ি এখন কত লোককে আশ্রয় দিচ্ছে। তাদের ছেলেপিলের সঙ্গে খেলা করে যে আনন্দ পাই, তার রস আগে জানাই ছিল না।—এই তো ব্যাপার, বুঝলে হে ভায়া!"

সমবায়-নেতার কথা

আমাদের গ্রামের চাষারা সমবায়ে অনেকে ঢুকতে পিছপাও বটে, কিন্তু সকলেই আমায় বলে— সমবায় দেখবে তো ক-গ্রামেরটা দেখো, ও রকম পেলে আমরা সবাই যোগ দিতাম। ক-গ্রাম বেশি দূর নয়, তাই অবসরমতো একদিন হেঁটে চলে গেলাম।

সে গ্রামে পৌঁছে প্রথমটা নতুন কিছু চোখে পড়ল না,— চারদিকে সেই অযত্নের লক্ষণ, শুয়োর মুরগিগুলো রাস্তায় উঠনে, বাড়ির ভিতর, যেখানে-সেখানে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমবায়ের আস্তানাটা গ্রামের ও-পারে, সেদিকে যেতে তবে নতুন জীবনের নড়াচড়া জানান দিল। ইঁটকাঠ খড় বোঝাই গাড়ির উপর গাড়ি আনাগোনা করছে—এ দৃশ্য গ্রামে বড়ো একটা দেখা যায় না।

সমবায়ের আপিসঘরের সামনে এসে, না বলে কয়ে ঢুকে পড়লাম। সবে তৈরি বাড়ি, এখনো টাটকা কাঠের সুগন্ধ ছাড়ছে। ঘরের দেয়ালে বিপ্লবীকর্তাদের ছবি টাঙানো, একটা তাকে মলাটের উপর কাগজমোড়া বই সাজানো, বড়ো বড়ো দুই জানলা দিয়ে হাওয়া আলো আসছে।

আমার দিকে পিঠ করে দুটি যুবা এক লম্বা টেবিলে বসে একমনে হিসেব মেলাচ্ছে। আমি গলার আওয়াজ দিতে তারা আমার দিকে ফিরে, তখনি অভিবাদন করে আমাকে বসতে বললে। এদের মধ্যে একজন সমবায়ের নেতা, বছর ত্রিশেক বয়স হবে, প্রফুল্ল তেজী চেহারা ; অন্যটি তার সহকারী, বাইশ বছরের সুন্দর নীলচোখো ছোকরা। দুজনেই চাষার ছেলে। আমার দেশে আসার সংবাদ এরা আগেই পেয়েছিল, বললে আমাকে এনে সব দেখাবার ইচ্ছে ছিল। আমি আপনি এসে পড়ায় আনন্দ প্রকাশ করলে।

নেতার ইঙ্গিতে সহকারী উঠে গেল; একটু পরে আমার জন্যে একটি রেকাবে বাজরার রুটি আর একপাত্র দুধ এনে দিলে। আমি খেতে বসলে নেতা বলতে লাগল,— "আপনি চাষাদের সব কাঁদুনি শুনেছেন নিশ্চয়ই ?"

"খুব শুনেছি !"

দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুচকে হাসল। নেতা বললে, "কিছু-দিন থাকলে আরো অনেক শুনবেন। যে কাঁদে না সে চাষাই না! আমি ভুক্তভোগী, জেনে বুঝেই বলছি। আমার এক খুড়োমশায় আছেন, তিনি কাঁদুনের সরদার।"

আর এক পত্তন হেসে— "আসুন আপনাকে সব দেখাই"— বলে দুজনে উঠে পড়ল।

বেরিয়ে আসতেই আপিসঘরের লাইনে, এক সার নতুন বাড়ি দেখা গেল। অনেকটা গ্রামবাসীদের বাড়ির ধাঁচার, তবে চাল উঁচু, দরজা-জানলা বড়ো, দুটি করে ঘর, সাজসরঞ্জাম সামান্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এগুলি সমবায়ীদের থাকার বাড়ি।

পরে যাওয়া গেল গোয়াল দেখতে। তিনটি মস্ত লম্বা চালা ঘর, এক একটিতে দেড়শ' দু'শ গোরু আরামে থাকতে পারে। চাষাদের গোয়ালের তুলনায় বেশ ফাঁকা খট্‌খটে চেহারা। এরা আশা করে এই বছরের শেষ নাগাদ শ' আষ্টেক গোরুবাছুর দাঁড়িয়ে যাবে; বাকি গ্রামের সব গোরু ধরলেও এত হয় না। শীতকালে চাষারা গোরুকে খড়বিচিলির কুটির সঙ্গে একটু আধটু ভুষি কিম্বা আলুর খোসা ছাড়া কিছু দিতে পারে না। এদের ব্যবস্থা ভালো, মার্কিন পদ্ধতি (silo) অনুসারে গর্মিকালে কাঁচা ঘাস-পাতা-ডাঁটা মাটির তলে পুঁতে রাখে, তাই দিয়ে বারো মাস রসালো জাব দিতে পারে।

আর এক চালায় শুয়োর রাখার জায়গা,—সচরাচর যেমন জঘন্য নোংরা দুর্গন্ধ হয়, এ তা নয়, বেশ সাফসুৎরো। দুটি মেয়ে দেখলাম সিদ্ধ আলু থেঁৎলে শুয়োরদের সান্ধ্যভোজনের যোগাড় করছে। এদের হিসেবমতো এ বছরেই ২৫০ শুয়োর হবে।

চালাগুলো পার হয়ে এক মনোরম উপবনে প্রবেশ করা গেল। আগে এটা ছিল জমিদারের খাস নন্দনকানন,—ইতর লোকের প্রবেশ নিষেধ। এখন হয়েছে সমবায়ী অসমবায়ী সকল গ্রামবাসীর মেলামেশা আমোদপ্রমোদের আড্ডা ; এখানেই সভাসমিতি নাটক সিনেমা গান বাজনা হয়ে থাকে।

এর পর নিয়ে গেল এক ফাঁকা জায়গায়, সেখানে অনেক বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয়েছে, তাতে বসবে কারখানা, ভাণ্ডার, স্কুল, হাঁসপাতাল ; পরে কুলোলে ক্লাবের জন্যেও একটা বাড়ি হতে পারে। এটা হবে গ্রামের ভাবী কৃষ্টিকেন্দ্র।

শেষে এক মাঠ দেখতে গেলাম যাতে ফলবাগান ফাঁদা হয়েছে। যতদূর চোখ যায়, রকম-বেরকম ফল গাছের চারার সার চলেছে। উৎসাহে উজ্জ্বলমুখ নেতা বললে, "আপনি আর বছর কয়েক পর ঘুরে আসবেন, এমন সব ফল খাওয়াব যা কখনো খাননি। এবার চলুন, একটা মজার জিনিস দেখাই।"

আপিসের কাছে ফিরে এসে, লাইনছাড়া একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালে মুরগির ডিমে তা দেবার কল।

নেতা বললে, "এর ইতিহাসে একটু মজা আছে, শুনুন। এই কল আনার বিষয়ে তো সমবায়-সভা ডাকা গেল, অন্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখানো হল, কত হাঙ্গাম করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম এর সুবিধেটা কী। সমবায়ীদের দল থেকে কত আপত্তি উঠল,— এরকম অস্বাভাবিক

উপায়ে কখনোই কাজ হতে পারে না ; জমিদারদের তো অর্থের অভাব ছিল না, তারা এ কল আনায়নি কেন। মার্কিন দেশে আছে তো কী হল, তাদের সবই ছিষ্টিছাড়া। এ দেশে ও কল চলবে না। অনেক বকাবকি অনুনয় বিনয় করে শেষ কল আনাবার অনুমতি পেলাম।

"শহরে কল তো ফরমাশ দেওয়া গেল। যখন এসে পৌঁছল, ওর অন্ধিসন্ধি কেউ ভেদ করতে পারলাম না। কোথায় রে বই—বই আনিয়ে পড়ে যা বুঝলাম সেইমতো কল তো চালানো হল, কিন্তু এমনি কপাল, একশ'র মধ্যে মোটে দুটি তিনটি ডিম ফুটল। তখন হাসি টিটকারির ধুম দেখে কে। ফিরিয়ে দাও কল, বেচে ফেলো কল, বললাম ও কল এখানে চলবে না,—মহা শোরশরাবৎ পড়ে গেল।

"আমরাও ছাড়বার ছেলে নই। আবার বোঝাতে বসলাম—দেখো ভাইসকল, কলের তো দোষ নয়, দোষ আমাদের আনাড়িপনার। ওস্তাদ নইলে কি কল চলে, বলো তো ওস্তাদ আনাই। কী ভাগ্যি, কথাটা লেগে গেল, বললে আচ্ছা আনাও, কিন্তু এবার খরচ নষ্ট গেলে আর হাসি নয়, মারধর হবে বলে রাখছি।

"সদরে লিখতে তাঁরা এই ওস্তাদনী পাঠিয়ে দিলেন"—ব'লে, নেতা এক মেয়েকে দেখিয়ে দিলে। "ইনি আসতেই আমি বললাম—দেখো ওস্তাদনী, তোমার উপর বড়ো গুরুভার। এবার ফেল হলে আর রক্ষে নেই। মেয়েটি এক কথায় বুঝে নিলে, কাজও যেমন জানে খাটুনিও খাটল তেমনি—না ওস্তাদনী ?" মেয়েটি একটু সলজ্জ হাসি হাসল। "যা হোক, সেবার মানটা রইল, শতকরা ৭০টা ডিম ফুটে বাচ্ছা হল। চাষারা মহা খুশি, এখন বলে আরো কল চাই।

"হায়রান হয়ে তো আপিসে ফেরা গেল। শ্রান্তি দূর করাবার জন্যে

আবার রুটি মাখন পনীর আনাল। খেতে খেতে ওরা জিজ্ঞেস করলে, "আপনার কেমন লাগল।"

"আমি তো বলি খুব চটকদার, কিন্তু গ্রামবাসী চাষারা কী বলে।"

"চাষাদের কথা ছেড়ে দিন, ওদের গাঁইগুঁই লেগেই আছে।"

সহকারী একটু টিপ্পনি কাটল—"এবার কিন্তু আপত্তির সুর বদলেছে। এখন বলে—সমবায়ের কাজ আরো তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে না কেন।"

গ্রামের ভিতর দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এক বুড়োর বাড়িতে একটু জিরিয়ে নিলাম। সে সময় তার দুই হৃষ্টপুষ্ট ছেলে সমবায়ের কাজ সেরে এসে খেতে বসল্।

বুড়োকে বললাম, "তোমরা তো দেখছি সমবায়ে আছ।"

"না থাকার কি উপায় রেখেছে।"

"দেখলাম তো কাজ ভালোই চলছে, কত রকম নতুন বাড়ি হচ্ছে।"

"হাঁ, বাড়ি বাড়ি বাড়ি। লোকে বাড়ি খাবে না কি। কত করে বললাম, বাছুর শুয়োর বেশি করে মারো, আশ মিটিয়ে সকলে মাংস খাই। কে কার কথা শোনে। জানোয়ার বাড়িয়েই চলেছে।'

বুড়োর কথায় ছেলেরা মুখ টিপে হাসছে, আর রুটি আলু ঘোল খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছে।

বুড়োর গন্‌গন্ থামে না—"কালে কী হয় বলতে পারিনে, এখন তো বে-বন্দোবস্তের এক শেষ। খালি খাটো আর খাটো, কার জন্যে তার ঠিক নেই। ছুটি নেই, উপরি নেই, ফুর্তিটুকু করার যো নেই। গোরু শুয়োরের মতো আমাদেরও না হয় ভালো বাড়িতে রাখে, ভর পেট খেতে দেয়, তাতেই কি সব হল। নিজের খেয়ালে চলতে না পেলে

কি মনে সুখ থাকে। নিজের বললে যদি দোষ হয়, তবে নিজের] উপর নিজের সম্পত্তির উপর ভিতরে ভিতরে এত মায়া কেন।”

বুড়োর কথার ছিরিতে ছেলেদের হাসি চাপা দায়:হল।

গোপিকা-কর্ত্রীর কথা

নিকটের আর-এক সমবায়-সম্পাদকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল—একটু ভারিক্কি ধরনের লোক। তাঁর বড়ো সাধ তাঁদের পরিদর্শিকার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেই উপলক্ষ্যে একদিন আমাকে তাঁদের আস্তানায় নিয়ে গেলেন।

সেখানে পৌঁছে দেখি লাল-ফিতে বাঁধা এক মাথা বাবড়িকাটা চুল নিয়ে একটি মজবুত চেহারার ১৮ বছর বয়সের মেয়ে এক মস্ত কালো গোরুর দুধ দুইতে বসেছে। মেয়েটির নাম বীরা (Vera)। তার দুধ-দোয়ায় আশ্চর্য কিছুই নেই, সমবায়তে দুহিতার কাজ মেয়েকেই দিয়ে থাকে।

“এই আমাদের কর্ত্রী”—বলে সম্পাদক আলাপ করিয়ে দিলেন।

“সামান্য গোয়ালিনীকে লজ্জা দেন কেন।”—মেয়েটি এই উত্তর দিতে না দিতে, আমাদের চেহারা দেখেই হোক, আর গলার আওয়াজ শুনেই হোক, গোরুটা চমকে উঠে দুধের বালতিটা উলটে পালটে বীরার কাপড় ছিঁড়ে দিলে।

সম্পাদক ব্যতিব্যস্ত হয়ে আক্ষেপ করে উঠলেন—“আহা, বাছা রে। বেচারীর কাপড়ের বড়ো টানাটানি, তার উপর আজকাল ভাণ্ডারে ভালো কাপড় পাওয়াই যায় না।”

এদিকে বীরা তো ছেঁড়া কাপড় ধরে অন্তর্ধান হল। সেই ফাঁকে সম্পাদক আমাকে তার বৃত্তান্ত কিছু শুনিয়ে দিলেন।

বীরা ছিল দরজীর মেয়ে। বিপ্লবের আরম্ভে বাপ মারা যায়। শ্রমিকের সন্তানের পক্ষে সব বিদ্যালয়ের দ্বার খোলা, জায়গা পাবার জন্যে উমেদারি করতে হয় না। বীরা শীঘ্রই বিদুষী হয়ে উঠে কৃষিতত্ত্বের ডিগ্রী নিলে। তার পর রাজধানীর বড়ো বিদ্যালয়ে আরো পড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওর গুণপনা দেখে কর্তৃপক্ষেরা তা করতে দিলেন না, ওকে সমবায়ের কাজে টেনে নিলেন। বীরার বিপ্লবে জ্বলন্ত নিষ্ঠা, সমবায়ের নিয়মকানুন কণ্ঠস্থ, বলতে কইতে, লোককে বাগাতে, বশ করতে ওর জুড়ি নেই, তাই ওকে এখানে নেত্রী করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ সমবায়ের বিশেষত্ব এই যে, এতে শুধু রুশ নয়, ইহুদী, পোল, লেট, লিথুয়েনীয়, পাঁচ দেশের লোক জুটেছে, সমবায়ী ক্রমাগত বেড়েও চলেছে। তাই উপযুক্ত নেতা চাই।

বীরার ঘাড়ে পড়েছে অশেষ রকমের কাজ। লেকচার, পাঠ, আলোচনা, আমোদপ্রমোদ, এ সবের আয়োজন করা তো চাই, তার উপর সমবায়ের সাপ্তাহিকপত্র চালানো, নানা জাতের সমবায়ীদের মিলমিশ করানো, ফাঁক পেলে গ্রামে গ্রামে প্রচারে বেরোনো। ওর সরকারী পদ হল পশুবেত্তা-দুহিতা, সে হিসেবে ওকে দিন তিনবার আটটি গোরু নিজে দুইতে হয়, তাতেও ঢিলেমি নেই। রাতভোর আলোচনা-সভা চালিয়ে এলেও দোয়াবার সময় বীরা ঠিক হাজির।

একটু পরে কাপড় ছেড়ে বীরা হাসিমুখে ফিরে এল, আবার সেই গোরু দুইতে বসল, যেন কিছুই হয়নি। আমি দোয়া দেখছি আর অবাক হয়ে ভাবছি, বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এই-সবে কৈশোর-পেরোনো মেয়েটুকুর ভিতর এত থাকতে পারে। দোয়া হয়ে গেলে গোরুকে গোয়ালে তুলে, সেখানকার অবস্থা ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে, বীরা

একপত্তন ছুটি পেল। তখন আমরা বাইরে এসে কাটাগাছের গুঁড়ির উপর গল্প করতে বসলাম।

সম্পাদক তামাশা করে আরম্ভ করলেন—"মোটরগাড়ি চড়বে বীরা ?"

সে উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"চড়ব বৈ কি। কোথায়, কার মোটর।"

"এই প্রবাসী ভায়ার।"

"কৈ। দেখছিনে তো।"

"না, না, আমি মজা করছিলাম। ইনি হেঁটে এসেছেন।—জান, প্রবাসী ভাই, আমাদের বীরার শখ সাধের অন্ত নেই। বলো না বীরা তোমার সব মনের কথা।"

বীরা। আমার এমন কী বেশি শখ দেখতে পেলেন।

সম্পাদক। তবু তোমার কী কী করতে ইচ্ছে করে বলো না।

বীরা। মোটরগাড়িতে বোঁ বোঁ করে লম্বা পাড়ি দিতে সত্যি বড়ো মজা। আর রাজধানীতে প্রধান বিদ্যালয়ের ডিগ্রীটা নিয়ে আসতে পারলে হত। আর এরোপ্লেনে উড়তে ইচ্ছে করে। আর কলের লাঙল চালাতে। আর-আর—একটা ভালো সিনেমার ছবি দেখতে,—এখানে যত পচা ছবি আসে। আচ্ছা, প্রবাসী মশায়, আপনাদের মার্কিন দেশের ছোটো গ্রামেও ভালো ছবি দেখায় ?

আমি। তা দেখায় বই কি।

বীরা। একেই তো বলি সুবন্দোবস্ত। আমরা এখনো অতটা এগোতে পারিনি। কিন্তু ক্রমে করে তোলা যাবে। তাহলে আপনাদের বিপ্লব আরম্ভ হলে এখানে বসে তার ছবি দেখব। তার আর দেরি কত বলুন তো।

আমি ভাবলাম আচ্ছা ছেলেমানুষের পাল্লায় পড়েছি। বয়স না ধরতেই একে নেত্রী বানিয়ে দিলে কোন্ বুদ্ধিতে।

সম্পাদক একটু হেসে বললেন, "একে যদি খুশি করতে চাও তাহলে বলে দাও পৃথিবীময় বিপ্লবের আয়োজন লেগে গেছে।"—পরে, আমাদের দুজনকে বসিয়ে রেখে তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন।

তাঁর শেষ কথার প্রতিবাদ করে বীরা বলে উঠল, "বাজে কথা কে শুনতে চাচ্ছে। সত্যি যা, তাই বলুন। মার্কিন দেশের শ্রমিককে তো কম উৎপীড়ন সইতে হয় না, তবে সে কেন ভোম্বলদাসের মতো চুপচাপ বসে আছে।

আমি বুঝিয়ে বললাম, যেসব মধ্যবিত্তেরা ধনীর খায় পরে, ধনীর দৌলতে বিলাসে থাকে, তারা দলে এত ভারি, তাদের অস্ত্রশস্ত্র রসদের যোগাড় এত বেশি, শ্রমিকেরা জানে বাদাবাদি করলে পেরে উঠবে না, তাই বিপ্লব পর্যন্ত এগোয় না।

বীরা। আমার তা বিশ্বাস নয়। বল পরীক্ষায় নামলে শ্রমিকের জয় হবেই হবে। সে যাই হোক, মার্কিন দেশের আরো অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করে, আপনি সব বলুন।

আমি। বিশেষ করে কোন্ কথাটা শুনতে চাও, বলো।

বীরা। এই ধরুন না, আমার বয়সী মার্কিন মেয়েরা কী করে।

আমি। স্কুল-কলেজে যায়, বই পড়ে, আমোদআহ্লাদ করে।

বীরা। রোজগার করে না ?

আমি। আজকাল অনেকে তাও করে।

বীরা। সে কথা ভালো। মেয়েরা নিজের জোরে না থাকলে তাদের গতিমুক্তি নেই। কিন্তু আপনাদের মেয়েরা আর কী করে বলুন।

আমি। কেউ কেউ রবিবারে গির্জেয় যায়।

বীরা। তাতে কী হয়।

আমি। মনে শান্তি পায় বোধ করি।

বীরা। চারদিকে যেখানে অশান্তি, নিজের মনে শান্তি পাওয়াটা কি বড়ো জিনিস। সেদিন চাষীদের বৈঠকে বলছিলাম – তোমাদের এই পিশু-ছারপোকা ভরা বাড়ি ছেড়ে সমবায়ে এসে মানুষের মতো থাকতে শেখো। তাতে তারা বললে—আমরা এইভাবেই বেশ শান্তিতে আছি। —নিজের বাড়ি, নিজের ধন নিজের শান্তি, এ কথাগুলোর উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু আপনাদের মেয়েদের বিষয়ে আসলে যা জানতে চাচ্ছি, তাই বলছেন না,—তাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী।

আমি। উদ্দেশ্য তারা নিজেরাই।

বীরা হতভম্ব হয়ে আমার দিকে ড্যাবড্যাবে চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, "আপনি কি বলতে চান তারা নিজে বই আর কিছু জানে না। মার্কিন সমাজে কুসংস্কার কুপ্রথা কিছু নেই, দীন দুঃখী বিপন্ন উৎপীড়িত নেই, যাদের জন্যে মেয়েদের কিছু করতে ইচ্ছে যায় ?"

আমি। সে রকম ইচ্ছে তো বড়ো একটা দেখতে পাইনে।

বীরা। কী আশ্চর্য। আমার অমন জীবন হলে হাঁপিয়ে মারা যেতাম—মনে হত কোন অকূলে হারিয়ে গেছি। বিপুল ভবে আমি একা—কী সর্বনাশ। সে শিউরে উঠল।

এমন সময় বাড়িভাঙা কাঠকাঠরা-বোঝাই গাড়ি সামনের রাস্তা দিয়ে আসছে দেখে বীরা গাড়োয়ানকে হেঁকে কিছু শিষ্টালাপ করে, পরে আমায় বললে, "পাশের গ্রামে কুধনীদের বাড়ি ভাঙা হল, তারি মাল-মসলা কর্তারা এ গ্রামকে দান করেছেন তাই নিয়ে আমাদের গাড়ি ফিরল।"

কুধনীর বাড়ি ভাঙা শুনে, মনে যে দুঃখ নিয়ে দেশে এসেছিলাম

তাই উথলে উঠল, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"কী সাংঘাতিক।"

বীরা। কিসে সাংঘাতিক।

আমি। বল কী। সদ্‌গৃহস্থ স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে কচিকাচা সব পৈত্রিক ভিটে থেকে আচমকা ঝেঁটিয়ে বার করে দিয়ে অচেনা অজানা জায়গায় মজুরি করতে চালান দেওয়া কী ভয়ংকর কথা।

বীরা। আপনার মতের সবাই হলে তো বিপ্লবই হত না।

আমি। তোমার নিজের কী মনে হয়,— কাজটা নিষ্ঠুর নয়?

বীরা। নিষ্ঠুর নিশ্চয়ই। আপনারা কি মনে করেন কুধনীকে নির্ধনী করতে আমরা আমোদ পাই? কত বার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তবু না করলে নয় বলে করে যাই। হয় রোগবীজ মারতে হবে, নয় রোগী মরবে। হয় ধনী, নয় সমবায়—দুটো এক সঙ্গে থাকতে পারে না।—দুঃখ প্রকাশ করছেন বটে, কিন্তু আপনি কি সত্যি কাঁদতে জানেন। জগৎজোড়া শ্রমিকের আর্তনাদে যদি আপনার প্রাণ কাঁদত, তাহলে মনও শক্ত হত। শ্রমিকে শ্রমিকে দেশভেদ জাতভেদ ধর্মভেদ নিয়ে লড়ালড়ি হয় না, সেসব খুঁচিয়ে তোলে মধ্যবিত্তেরা নিজের নিজের কাজ হাসিল করার জন্যে; মরতে মরে শ্রমিকেরা। বলতে বলতে বীরা রণরঙ্গিণী মূর্তি হয়ে উঠল।

এ কথার পর কী আর বলি, জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি কি বন্দুক চালাতে জান বীরা।"

বীরা। তা না জানলে বিপ্লবের ভিতর আসি?

আমি। আবার যদি যুদ্ধ বাধে, তুমি লড়াইয়ে যাবে?

বীরা। আমায় কে ঠেকিয়ে রাখে, তাই দেখব।

আমি। সে কী, সঙিন নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে বাধবে না?

বীরা। দেখুন, প্রবাসী মশায়, ধনী আর ধনীর পুষ্যি মধ্যবিত্ত ছাড়া

জগতে আমাদের কেউ শত্রু নেই। তারা যদি কোনোদিন বাগে পায়, আমাদিকে যে কী করবে আপনি তা কল্পনাও করতে পারেন না; স্ত্রীলোক বালক কারো নিস্তার থাকবে না। নিজেকে বাঁচাতে হলে তখন যে অস্ত্র হাতে পাই তাই চালাব। বীরত্ব কি পুরুষমানুষের একচেটে করতে চান।

বীরাকে আর ছেলেমানুষ মনে হল না। ওর কথায় বাহাদুরির সুর নেই, মুখে যা বলছে দরকার হলে তাই করবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না। ধর্মের দোহাই, রাজার হুকুম, স্বদেশের প্রতিপত্তি, এই সব উত্তেজনার জোরে অন্য দেশে অন্য কালে লোকে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে মারতে মরতে গেছে,—তা তো জানা আছে। এরা তো বাইরের কোনো শক্তিকে ডাকে না; সাধারণ মানুষের দুঃখের দরদে এদের আত্মশক্তি জেগে উঠেছে; এরাও মারতে মরতে প্রস্তুত। না জানি কিসের জোরে এরা খাড়া আছে, এত তেজে চলছে।

বীরার নিজের মুখে শুনব বলে জিজ্ঞেস করলাম,—"তুমি তো দেখছি ধর্ম মান না, শান্তি চাও না, তবে তোমার মন কিসের প্রয়াসী।"

বীরা। আমি চাই প্রেম, আরো প্রেম।

আমি। দাম্পত্য প্রেম?

বীরা। সে জিনিসটা কী তা জানিনে।

আমি। তবে যাকে বলে স্বাধীন প্রেম, তাই নাকি।

বীরা। তা নয় তো কি।[১] ফরমাশী প্রেমকে প্রেম বলেন!

আমি লিখে যাচ্ছি দেখে বীরার কৌতূহল হল। আমার কাছে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলে, "আমার কথা টুকে রাখছেন না কি।"

---

১ য়ুরোপীয় ভাষায় স্বাধীন প্রেম বলতে স্বেচ্ছাচার বোঝায়। বীরা কথাটার ভালো মানে ধরল।

আমি। হাঁ, যতটা পারি।

বীরা। দেখবেন, আমার মুখে উলটো কথা বসিয়ে দেবেন না।

আমি। সে বিষয়ে সাবধান থাকব, ভয় নেই।

লেখা শেষ না হতেই বাইসিকেল চড়ে এক যুবক উপস্থিত— ফিট-ফাট নীল বিপ্লবীকুর্তা গায়ে, মাথায় নতুন টুপি, পায়ে পালিশ-করা জুতো, ভাষাও মার্জিত,—চাষার ছাঁদের নয়। "ইনি জেলাস্কুলের শিক্ষক", বলে বীরা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। তিনি এসেছেন ছেলেমেয়েদের এক আলোচনাসভায় বীরাকে নিয়ে যেতে। বীরা তখনি রাজি। "চট করে একটু মুখে হাতে জল দিয়ে আসি" বলে আমার কাছে বিদায় নিয়ে গেল।

চমৎকার সন্ধ্যেটি হয়েছে, ঝকঝকে আকাশ, ফুরফুরে মিঠে বাতাস,—এর সঙ্গে মানায় গল্পসল্প, হাসিখেলা, নাচগান, না হয় আনমনে একা বসা। কিন্তু সমস্ত দিন বেদম খাটুনির পর এ মেয়ে চলল কোথায়, না ক্রোশ খানেক পথ হেঁটে এক বদ্ধ স্কুলঘরের ভিতর রাত দুপুর পর্যন্ত আলোচনা করতে যারা বৈঠকে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, তারাও সারাদিন খেটেখুটে এসে জমায়েত হয়েছে। আলোচনার বিষয় যে কৃষ্টিতত্ত্ব, তা ভালো করে বুঝতে বোঝাতে পণ্ডিতেও হার মানে—

ধন্য তোমরা বিপ্লবের ছেলেমেয়েরা। তোমরা কোন্ আলো দেখে ছুটে চলেছ, জানিনে,—কিন্তু তোমাদের মার নেই।

প্রবাসীর কথা এই পর্যন্ত।

তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও ধুয়ো ধরি—বীরার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। USSR যদি সত্যি প্রেমের প্রেরণায় চলতে থাকেন, তাহলে অন্তরের হোক, বাইরের হোক, রিপুর কী সাধ্যি তার লক্ষ্মী সমেত নারায়ণ লাভের পথ আটকায়।

পঞ্চম পালা

চতুর্বর্গের ফল-বিচার

ফলেন পরিচীয়তে

ফল দিয়ে শুধু গাছের নয়, বীজ্ থেকে আরম্ভ করে, মাটির, মালীর, মালিকের,—সকলেরই কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্যে যত্ন করা হয়ে থাকলেও কোনো একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে প্রবচনের দোহাই দিয়ে "তবে দোষ কী?" বলে বসে থাকলে হয় না। বরং প্রবচনটার মানে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে, দোষটা কোথায়, মাঝের নানান ধাপের মধ্যে গলতিটা ঠিক কোনখানে ঘটেছিল, খুঁজে বার করার মজুরি পোষায়। বিজ্ঞানীদের সেই ত্রীন-করবি[১] মন্ত্রই এ যুগের উপযোগী—try try try again

ফলের বিষয়ে ভাবার আরো কথা আছে। একই ফল ফলাতে অনেক উপকরণ লাগে, আবার একই আয়োজনে রকম-বেরকমের ফল পাওয়া যায়,—বিশেষত যদি সমীকরণ যজ্ঞের মতো জটিল আয়োজন চলতে থাকে। তার মধ্যে কোন্ ফলটা ধরে গুণাগুণ যাচাই হবে, সেটা যাচনদারের নিজের ধাতের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

য়ুরোপের এখন লড়াক্কে মেজাজ; USSR-এর ফৌজ, যুদ্ধ জাহাজ, এরোপ্লেন,—এ সবের চেকনাই দেখলে য়ুরোপীয় বিচারক খুশি না হোক, তার ভক্তি আসে। মার্কিন দেশে বস্তু বোঝে; USSR-এর কারখানার অশেষ মাল, খনির অফুরন্ত তেল, ক্ষেত্রের বাড়ন্ত ফসল, এ সবের রটনা

---

১ শ্রোতাকে সাবধান করে দিতে হয়; সংস্কৃতশাস্ত্র মন্থন করলে এ নামের মন্ত্র মিলবে না।

কানে গেলে কেজো মার্কিন প্রশংসা না করুক, ভাগ বসাতে লালায়িত হয়ে খোশামোদ লাগায়।

এক এক দেশের নাম দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হল বটে, কিন্তু সব দেশে নানা ভাবের লোক থাকে যারা বিচারে বসলে নিজের রুচিমতে পরদেশ সম্বন্ধে একতরফা রায় দিয়ে খালাস হয়। তাই নির্বিচারে পরের সম্বন্ধে লোকের কথা মেনে নিলে প্রায়ই ঠকতে হয়; এমন কি নিজের বিষয়ে যে যা বলে তাও বুঝেসুঝে নেওয়া ভালো। না দেখেশুনে পোকাধরা ফল চিবোতে চিবোতে আমি নিরামিষাশী বলে বড়াই করলে তো হয় না; অন্যদিকে পরের হিতের ভাবনায় যে পাগল, সে নিজেকে নাস্তিক বললে আমরা কি তা মানতে বাধ্য।

USSR-এর বস্তু ভালোই বাড়ছে, আরো বাড়বে বলে লক্ষণ দেখা যায়। তবে, বস্তু যে-দেশের সে দেশেই আগলানো থাকে, তাতে লোভ করে লাভ কী। কিন্তু ভাবের দেশকাল নেই, একার ভোগে তাকে আটকে রাখা যায় না। সেজন্যে আমরা চাই USSR-এর ভাব বুঝতে, লোভনীয় লাগলে আদায় করে নিতে।

ভাব কথাটাই বেশ রসে ভরা। ভাব হল মনের বাস্তুভিটে, বিশ্ব-রাজ্যের যে জায়গাটুকু আপনার করে নিয়ে মন গুছিয়ে বসেছে। "দু'জনে বড়ো ভাব"—মানে দু'জনের মন এক বাসায় থাকে, অন্তত পরস্পরের কাছে ঘন ঘন যাওয়াআসা করে। এমন কুনো মনও দেখা যায় যে নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরতে পারে না; তার পক্ষে অন্যের ভাব বোঝা অসাধ্য। জনবৃষের বাচ্ছা বৃন্দাবনে গিয়ে পড়লে না জানি কী ঢঙে সেখানকার লীলা খেলত।

ভাবের পরীক্ষা সম্বন্ধে সাবধানে থাকার বিষয় এই, যার পরীক্ষা করা হয় আর যে পরীক্ষা করে, বিচারফলের মধ্যে দুজনেরই ভাব মিশে যায়।

আবার রায় যে দেয় আর রায় যে শোনে, এদেরও ভাব মেশামেশি না হয়ে যায় না। ভাবের মতো সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে তা হবেই। কিন্তু তাতে দোষই বা কী। শেষে যে ভাব ফুটে ওঠে সেটা যদি উপাদেয় হয়, তাহলে কার মনে কতখানি ছিল তাই নিয়ে ঘোঁট না করে তাকে পরমানন্দে আত্মসাৎ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চতুর্বর্গ বলতে কী বোঝায়, তাও আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া মন্দ নয়। মান্ধাতার আমলের এইসব কথার আজকাল মা-বাপ নেই, যে যেমন খুশি ব্যবহার করে। তাই কথকের মানেটা শ্রোতার কাছে প্রথমেই গেয়ে রাখা ভালো ; আখর দেওয়ার সময় তাহলে ভুল বোঝা-বুঝির ভয় থাকবে না।

এই দেখো না কেন, আজকাল আমাদের দেশে বল, আর যে দেশেই বল, ধর্ম বলতে বোঝায় কাড়াকাড়ি করার, অন্তত মানুষ থেকে মানুষকে তফাত রাখার একটা ছুতো। সমীকরণের কথা ভালো মনে বলতে শুনতে বসে ধর্মের সে মানে নিয়ে আমরা কী করব। যাতে ধরে রাখে সেই ধর্ম—ভারতবর্ষে আগে চলতি এ মানে তো বেশ ছিল। কোন্ কোন্ ভাব USSR-কে বজায় রেখেছে, শক্তি যোগাচ্ছে, সে ভাব অন্যেরও কাজে লাগতে পারে কিনা, ধর্মের বর্গে তাই বোঝার চেষ্টা করা যাবে।

তার পর হল, অর্থ। এ কথাটা এমন হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে, যাতে লাগাও তাতেই লাগে। আপাতত ওকে সম্পত্তির উপর আটকে রাখলে আমাদের কথার সুবিধে হবে। ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি অনর্থের কারণ, সে বিষয়ে হিন্দু আচার্যের সঙ্গে USSR-এর একমত। এখন দেখতে হবে, USSR-এর নববিধানে সমবায়ের হাতেও সম্পত্তি পরমার্থের ব্যাঘাত করছে কি না। এটাও দেখার বিষয়, ব্যক্তিকে সম্পত্তিছাড়া আর লক্ষ্মীছাড়া করা এক কথা হয়ে দাঁড়ায় কি না, ঐহিক

উৎকর্ষ সাধনে তাকে উদাসীন করে তোলে কি না। লক্ষ্মীর মান রেখে বিচার করতে হলে, দেবীর বস্তুতান্ত্রিক স্থূল মূর্তি গড়লে চলবে না, আনন্দলাভ দিয়ে তাঁর প্রসাদকে মাপতে হবে।

তৃতীয়বর্গ, কাম। ব্যবহারের দোষে কথাটা যাচ্ছে-তাই হয়ে গেছে। আমাদের কথা গোড়ায়ও যা ছিল, শেষেও তাই,—মানুষের মূল ঐহিক কামনা হচ্ছে, জগতে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা। সেটা সম্ভব করতে হলে নরনারীর আপনাদিকে নারায়ণের, বিশ্বমানবের, অংশ বলে বোঝা দরকার। সে বোধ অন্তত আমাদের দেশে এ পর্যন্ত হয়নি।

দেবী ব'লে হোক, আর রমণী-কামিনী বলেই হোক, হিন্দুর মন স্ত্রীজাতির ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে থাকে বটে, কিন্তু সেরেফ নারী বলে তাঁদিকে নিজের মহিমায় ফুটতে না দেওয়ায় বেচারীদের মন একেবারে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দিদিমার বা বাড়ির পুরানো ঝির পরামর্শমতো এর পায়ে ওর পায়ে মাথা নোওয়াতে, পাণ্ডাপুরুতের ফরমাশ মতো এ-জলে ও-জলে মাথা চোবাতে তো শেখে, কিন্তু কালের উপযোগী কোনো ভাব কি আদর্শ শেখায় কে। আরো মুশকিল এই, যাঁদের শিক্ষার ত্রুটিতে হিন্দুনারীর এই দশা, তাঁরাই তাচ্ছিল্য করে তাদিকে ধর্ম-অর্থ উপার্জনের পথের কাঁটা বলেন।

বৃথা আক্ষেপ করার জন্যে এ কথা তোলা হয়নি। শাস্ত্রে বলে "নয়"কে বেশ করে চিনে ফেলাই "হয়"কে পাবার একটা উপায়। USSR-এর বিধানে নরনারীর যা সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, সেখানকার বিপ্লবী সমাজে নারী যে স্থান পেয়েছে, তাতে আত্মোন্নতির সুবিধে অসুবিধে কেমন, তাই আমাদের এ পালায় বোঝার বিষয় হবে, সেজন্যেই এই তুলনামূলক সমালোচনা।

বাকি রইল মোক্ষ,—আকাশের মতো একটা মস্ত ফাঁকা কথা।

পণ্ডিতী চালে আলোচনায় বসলে না-বোঝার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার ভয়, তাই সাদা ভাবেই কথা পাড়তে হবে।

মানুষমাত্রেই মুক্তিপথের যাত্রী, পদে পদে পুরোনোর খোলসমুক্ত হয়ে তাজা জীবনে পা বাড়াতে না পারলে সে জেয়ান্তে মরা হয়ে থাকে। কিন্তু বাকির বহর দিয়ে নয়, কাজ দেখে বুঝতে হয় মুক্তির পথে কে কতটা চলতে পেরেছে। মুখে "বসুধৈব কুটুম্বকম্,"—কাজে একে ছুঁইনে, ওর পাশে বসিনে, তার হাতে খাইনে; চাই "মনের মানুষকে," —সামনের মানুষের সুখদুঃখ মনে লাগে না; যাব আনন্দধামে,— বিধাতার নিত্যদানের রস তৃপ্তি ক'রে গ্রহণ করতে জানিনে, এই কি মুক্তির পথে এগোবার চেহারা।

USSR-এর নরনারীরা নানা সমবায়ের মধ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ায় তারা অন্তত এক পত্তন "আমি, আমার", থেকে "আমাদের" বড়ো কোঠার মধ্যে মুক্ত হয়েছে। এখন দেখার, ভাবার এইটুকু বাকি যে, সংঘে জড়িয়ে প'ড়ে, নিজত্ব হারিয়ে, ব্যক্তির চরম বিকাশের বাধা কিছু ঘটছে কি না। এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চতুর্বর্গের বিচারও সাঙ্গ হবে।

ধর্ম এব হতো হন্তি

বিপ্লবের আগে, রুশ ভক্তির দেশ, ভক্তের দেশ, ধর্ম্মরাজার পুণ্য-প্রজার দেশ বলে য়ুরোপে তার নামডাক ছিল। Kiev-নগর ছিল রুশের কাশী, পাহাড়ে উপত্যকায় বনে-বাগানে মিলিয়ে অতি মনোরম স্থানে পত্তন করা। সেখানে কিবা মঠ মন্দির পাণ্ডা-পুরোহিতের ধুম, মন্দির-গির্জের ভিতরে সোনারুপো জহরতের বাহার, ঝলমলে ঝাপ্পাঝোপ্পা-পরা পূজারি-পাদ্রীদের সকালসন্ধ্যে মন্ত্র আওড়ানোর ঘটা, কঠোরতার

নানাচিহ্নধারী গুহাবাসী[1] তাপসদের ভিড়, দেহরাখা সাধুসন্তদের সমাধিস্থানের ছড়াছড়ি, ব্যাধিহরা পুণ্যভরা জলের রকমারি আধার—সে দেশকালের ধারণামতো ধর্মের যা-কিছু তোড়জোড় দরকার, কোনোটারই ত্রুটি ছিল না।

আর তেমনি বিনয়ে-হেঁট-মাথা, যা-বল-তাই-সই-গোছের নিষ্ঠাবান্ প্রজার দল। তারাই মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা রোজগারের ভাগ যুগিয়ে এই বিরাট ধর্মব্যাপার বজায় রেখেছিল। রোগশোক শান্ত করার প্রয়োজন বোধ করলে, কিম্বা লালদিনে[2] পুণ্যসঞ্চয় করার ঝোঁক চাপলে, ছেলে-বুড়ো-স্ত্রীলোক মিলে তারা লাঠিহাতে বোঁচকাকাঁধে, পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এই সব মঠ মন্দিরে লাখে লাখে গড করতে যেত; ইষ্টমূর্তির সামনে বাতি চড়াত; মৃতসন্তদের তুলে রাখা গায়ের কাপড়ে চুমো খেত; পাণ্ডাপাদ্রীর কাছ থেকে পবিত্র জল কিম্বা আশীর্বাদ কিনে আনত।

সেখানকার বিগ্রহদের পশুরক্তে রুচি ছিল না বটে, তবে তাদের কাছে বর আদায়ের আশায় ছোটোবড়ো মোমবাতি থেকে আরম্ভ করে দামী দামী গয়না পর্যন্ত মানত করা হত,— তা অপরকে ঠকানো, জব্দকরা, পীড়া দেওয়ার বর চাইলেও সে সব অমায়িক বিগ্রহবৃন্দের বিরক্তির কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেত না।

কয়েকটি করে গ্রাম মিলিয়ে একটা করে গির্জে, আর সেই সঙ্গে একটি পাদ্রীবাবাজি (batushka) বরাদ্দ ছিল—তাদেরও খরচ অবশ্য চাষাভুষোকেই বইতে হত। সাধারণ প্রজার তুলনায় থাকার বাড়িটা

১ মাটির তলায় সুরঙ্গের মধ্যে অসংখ্য গুহা ছিল, যেখানে তাপসেরা কালক্ষেপ করত; তাকে জীবনযাপন বলা যায় কি না সন্দেহ।

২ সন্তদের আবির্ভাব তিরোভাবের পর্বদিন খ্রীস্টান পাঁজিতে লাল অক্ষরে লেখা।

বাবাজি ভালোই পেতেন, আর লাগাও অনেকখানি জমি থাকত যাতে যজমানদের সাহায্যে বাবাজির পরিবারবর্গের ফলমূল-সবজির চাষ করে শৌখিন খাবারের যোগাড়টা হত। তাছাড়া অতিথি উপস্থিত হলে সেবার আয়োজন—দুধ ডিম পনীর মাংস—দেখলে মাসহারার হারটা মন্দ ছিল বলে মনে হত না। তার উপর রুশের প্রথামতো চৌপর দিন গরম চা তো চলতই।

বাবাজির কাজের মধ্যে গ্রামবাসীদের জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, নামকরণ উপলক্ষে ধর্মসংগত ক্রিয়াকর্ম তিনি চালিয়ে দিতেন; আর রবিবারে পর্ববারে সদুপদেশ দিতেন, বিধাতার খাতিরে নিজের হীনাবস্থা নির্বিবাদে মেনে নিতে, পরলোকের দিকে তাকিয়ে রাজার কর ধর্মের বৃত্তি, যোগাবার ক্লেশ ভুলে থাকতে। শুধু মৌখিক উপদেশই বা কেন, বাবাজির সুখশান্তিময় জীবনযাত্রা দেখলে, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে সে বিষয়ে কি সন্দেহ থাকতে পারত।

হঠাৎ এসে পড়ল বিপ্লব। সর্বত্র যেমন দেখা যায়, এখানেও তাই, —পায়ের-তলার-মানুষের মাথা-তোলার বিপক্ষে কর্মকর্তায় ধর্মকর্তায় একজোট হলেন। মোহন্ত পুরুত পূজারি যতরকমের পাদ্রী ছিল সকলে মিলে ভগবানের নামে ধর্মের ধ্বজা তুলে, ইহকাল পরকাল নাশের ভয় দেখিয়ে বিপ্লবীদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা পেলেন। কিন্তু তারা ভোলবারও নয়, ডরাবারও নয়, যেমন গোঁয়ার তেমনি ঠোঁটকাটা।

বিপ্লবীরা বলে বসল—দলে না থাকলেই শত্রু; কাজেও দেখাল তাই। মঠ মন্দির গির্জে সমাধি যার যার সম্পত্তি সব কেড়ে নিয়ে, পাদ্রী-বাবাজিদের ছোটো বড়ো সবাইকে ইতরের কোঠায় নামিয়ে এনে, তাদেরই দেওয়া উপদেশ মতো পরকালের আসার আশে ইহকালের জ্বালা জুড়োবার সুযোগ পাইয়ে দিলে।

ধার্মিকেরা অবাক। ধর্মস্থানের ধর্মঅনুষ্ঠানের ধর্মযাজকের এ হেন অপমান, অথচ ভগবানের কোপের কোনো চিহ্ন নেই। ধরণী দ্বিধা হওয়া দূরে থাক্ একটুও কাঁপল না, কারো মাথায় বাজও পড়ল না। আর রুশের সেই ডাকসাইটে ধর্মপ্রাণ চাষীবৃন্দ,—তারাই বা কোন্ প্রাণে এই সর্বনাশ সয়ে গেল। এমন না যে তারা একেবারে মাটির মানুষ, রা কাড়তেই জানে না। খেতে না পেলে তারা কতবার খুনোখুনি কাণ্ড করেছে। কী সম্মোহন মন্ত্র জানে বিপ্লবীরা যে তাদিকে এমন কেঁচো বানিয়ে দিলে।

যাঁরা চোখ চেয়ে দেখলেন, তাঁরা কিন্তু এমন কিছু তাজ্জব হবার কারণ পেলেন না। শিখিয়েছ নির্বিবাদী হতে, হয়েছে নির্বিবাদী, তাতে আর আশ্চর্য কী। দিশাহারা হলে চাষারা যাদের কাছে বিধান নিত তাদের বিপদে এখন বিধান দেয় কে। কাজেই ধর্ম বলে যা জানত, এখন জানল তার উপর নির্ভর করা চলে না। গির্জের কর্তাই শ্রীহীন, কার খাতিরে গির্জেয় যাবে। কাজেই চাষায় নিজের পথ নিজে দেখতে লাগল।

দেখাশোনার লোক নেই, গির্জে ভেঙে পড়ছে, ভাঙা ইটকাঠ যে-যার বাড়ির কাজে লাগিয়ে নিলে। রবিবার এখন হল গ্রামবাসীর আরামের দিন,—বাড়ি বসে গৃহস্থালি তদারক, খোসগল্প, হাসিখেলা এই সবের অবসর পায়। এতে বিচলিত হবার কোনো কারণও দেখে না, ভগবানের অসন্তোষের লক্ষণ তো নেই; জীবনের সুখদুঃখ আগের মতোই, বরং করবৃত্তি উঠে যাওয়ায় অবস্থা হয়েছে সচ্ছল। এমন বিপ্লব মেনে নেওয়ার জন্যে কি কোনো মন্ত্রতন্ত্র লাগে।

তবে বিপ্লবী কর্তারা একটু কৌশলও খেলেছিলেন। জমির স্বত্ববদল নিয়ে তাঁরা চাষাদিকে অকালে ঘাঁটাননি। বিপ্লবের নতুন ধারা

গা সওয়া হয়ে যাবার পর তবে সমবায়ে চাষাদের ডাক পড়ল, তখন কাজ হাসিল করতে বেশি বেগ পেতে হল না।

তার পর খ্রীস্টানমহলে রব উঠল—বিপ্লবী-পুঁথির কুশিক্ষায় চাষাদের ধর্ম নষ্ট করে তাদিকে নাস্তিক বানিয়েছে।

এ সিকায়তে আমরা কি সায় দিতে পারি। প্রথমত একটি বিশেষ খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের বিগ্রহে, ক্রিয়াকর্মে, আস্থা হারানোকে, বা তারা ভগবানের যে স্বরূপ প্রচার করে তার মাহাত্ম্য স্বীকার না করাকে, কেমন করে নাস্তিকতা বলা যায়।

তবে বিপ্লবীরা এমন কথা কেন বলে—"গরীবের তিন শত্রু,—ধনী, শয়তান, আর ভগবান। ধনীকে তাড়িয়েছি, শয়তানে আর বিশ্বাস করি নে, এখন ভগবানকে বিদায় দিলেই হয়।" এ কথা শুনে ভক্তেরা কানে হাত দেবেন, আমাদের বদন কিন্তু অম্লান থাকে। এমন কি, জানতে ইচ্ছে করে, "ভক্তদের হাত থেকে বাঁচাও"—ভগবান কখনো এমন আক্ষেপ করেন কি না।

চাষারা যখন রাজ-আমলার আর জমিদারের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে জেরবার হয়ে পড়েছিল, দিনের পর দিন বছরের পর বছর সুখ দূরে থাক্ সোয়াস্তি কাকে বলে তাই জানত না, তখন ধর্মযাজকদের কাছে না মিলল অন্যায়ের প্রতীকার না প্রতিবাদ, পেতে পেল ফাঁকা উপদেশ —"সবই তাঁর ইচ্ছে, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকা মহাপাপ।"

বিপ্লবের ঝাঁকানি খেয়ে তাদের বুদ্ধি যখন একটু খুলে গেল, তখন যাঁকে যন্ত্রণাময় অবস্থার মূল কারণ বলে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তাঁকে "মিত্র" বললে ভাষার একটু উলটো প্রয়োগ হত না কি।

তার চেয়ে, আমাদের শাস্ত্রের উপদেশমতো তাদিকে যদি বোঝানো হত যে, "তাঁর শক্তি তোমার মধ্যেই ; তাঁর ইচ্ছায় নয়, তাঁর অভাবে

তোমরা হীন হয়ে আছ ; আত্মশক্তি জাগাও, তাঁকেও পাবে।" তাহলে চাষার মনে ভগবানকে শয়তানের সঙ্গে এক কোঠায় বাস করতে হত না।

সাধে এক নাস্তিক বলেছিল— "আমরা তো ভগবানকে নিন্দে করিনে, যাকে মানিনে তার নিন্দেই বা কি প্রশংসাই বা কি। কিন্তু তোমরা ভক্তেরা তোমাদের মনগড়া ভগবানের বড়াই করতে গিয়ে তার রূপ যেরকম দেখাও, তাতে মানহানির অপরাধ আসে বই কি।"

বাস্তবিক অদ্ভুত ভাবে ভগবৎ-রূপ-ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে করা হয় বলেই আমাদের আলোচনায় ভগবানের নাম আনতেই ভয় হয়, পাছে শ্রোতা অনবধানে আমাদের কথার সঙ্গে সেরকম ভাব জড়িয়ে ফেলেন।

যাই হোক্, অনেকদিনের চাপা-পড়া আত্মশক্তি গতানুগতিকের বাঁধ ভেঙে যখন প্লাবনের মতো রুশে দেখা দিল, তাতে 'আমরা আছি, আমরা থাকব', 'আমরা উঠব, আমরা ওঠাব', চারদিকে এই সব ভরসার ধ্বনি শোনা যেত, এখনো যাচ্ছে। নাস্তিকতার 'কেঁই কেঁই, নেই নেই' বিলাপ তার মধ্যে কোথায়।

মানুষের প্রতি মানুষ স্বাভাবিক প্রীতি নিয়ে ধরায় আসে। রিপুর আক্রমণে সে-প্রীতি চাপা পড়ে যায় ব'লে 'ভব'টা এত নিরানন্দ। বিপ্লবের ধাক্কায় রিপুগুলো একপত্তন সরে যেতে রুশবাসীর পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক টান ফুটতে পেয়ে তাদিকে সমবায়ে বেঁধে ফেললে। প্রীতির বাড়া কি ধর্ম আছে, ভালোবাসার চেয়ে জোর বাঁধন কি থাকতে পারে।

প্রীতির অভাবে ক্রিয়াকর্ম বল, মন্ত্রতন্ত্র বল, সে সব শুধু বৃথা নয় আফিমের নেশার মতো অনিষ্টকর,—প্রীতির অভাবের জ্বালা উপস্থিত-মতো ভুলিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিরুচির অধঃপতন ঘটায়।

দেশবাসীকে খাড়া করে তোলার জন্যে বিপ্লবী কর্তারা সেই আফিম বন্ধ করলেন, তাতে পুরোনো নেশাখোর যারা ছিল তাদের কিছু কষ্ট হল বটে, কিন্তু ধর্মনষ্ট হওয়ার অভিযোগটা আমাদের কানে কিছু অদ্ভুত শোনায়।

মানুষে মানুষে প্রীতির যোগসাধন হলে কর্মের কৌশল, কর্মের সুফল, কর্মের আনন্দ সবই বাড়ে তা শাস্ত্রেও লেখে, কাজেও দেখা যাচ্ছে। তবে ধর্মের বাকি থাকে কী। যদি বল 'বাকি রইলেন ভগবান!' তবে সে কথাটা একটু ভাবতে হয়।

ভগবানকে ডাকার কত কৌশল মানুষে বার করেছে—মনে জপ, হাতে জপ, লিখে জপ, এমনকি তিব্বতী কায়দায় জলের স্রোতে কল ঘুরিয়ে জপ ; মন্ত্র উচ্চারণের বিড়বিড়, গুনগুন, হুংকার ছাড়ার আওয়াজ, কাঁশর ঘণ্টার কানে-তালা-লাগানো আওয়াজ, ঢাকঢোলের আকাশ-ফাটানো আওয়াজ ; কিন্তু এত করেও আমাদের মতো সিধে বুদ্ধির দর্শকের মনে সেই সন্দেহ জাগতে থাকে,—"ভগবানই বাকি রইলেন বুঝি।"

কোনো কল্পিত রূপকে সারাদিন চোখের সামনে ধরলে, মানুষের দেওয়া যে-কোনো নামকে অষ্টপ্রহর আওড়াতে থাকলে, তাতে তো ভগবানকে জবরদস্তি হাজিরও করা যায় না, তাঁকে আনার সামিলও হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, তিনি যখন স্বয়ং নিজমূর্তি ধরে আসেন, আমরা চিনতেই পারিনে। তবে তাঁর আগমন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার এক লক্ষণ ঋষি বাতলে দিয়েছেন,— "তাঁর সাক্ষাতের আনন্দ যিনি পেয়েছেন, তিনি কখনো কিছুতে ভয় পান না।"

রুশের বিপ্লবী গ্রামবাসীদের আমরা যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে ওদের মধ্যে পরস্পর প্রীতির অভাব দেখা যায় না, আলগা আলগা থেকে ধ্বসে পড়বার লক্ষণ কিছু নেই। দলে দলে ভেদ, জাতে জাতে ভেদ,

বিচারে রুচিতে ভেদ,—এরকম ছন্নছাড়া হয়ে ধর্মকে মারলে ধর্মের পাল্‌টা মার কেমন ক'রে খেতে হয়, আমরা ভুক্তভোগী তা হাড়ে হাড়ে জানি।

ধর্মকে অন্যভাবে মেরে রুশের রাজপুরুষরা তাদের ধামাধরা ধর্মজীবীদিকে সঙ্গে জড়িয়ে ধর্মের মারে সমূলে ধ্বংস হল। কিন্তু ঐ রুশেরই প্রজারা ধর্মমারা পাপে লিপ্ত না থাকায়, বিপ্লবের দ্বারা তারা উদ্ধার পেয়ে গেল। তাদের মধ্যে আগে যারা জেগে উঠল, কিবা নর কিবা নারী, তারা নিজেকে ভুলে অন্য যারা মোহনিদ্রায় আধা-অচেতন, তাদিকে বাঁচিয়েঃ তুলতে প্রাণপাত করছে। ফলে রুশের জাগ্রত আত্মশক্তি রাষ্ট্রকে সমবায়ে সমবায়ে জড়িয়ে এমন অভেদ্য বর্ম পরিয়েছে যে যত পাশ্চাত্ত্য রাজতন্ত্রী আছে, তারা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও ভয় দেখাতে পারেনি। ভয় পেতে অপর পক্ষরাই পাচ্ছে, এদের তেজ দেখে তাদের বিরুদ্ধতার ঝাঁজ আপনিই মরে আসছে।

এখানকার শেষ প্রশ্ন এইটুকু—এমন ভাবে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত যারা, তারা ভগবানের কোনো বিশেষ নাম উচ্চারণ করে না বলে তাদের কি ধর্ম নেই। কানাই বিনা খেয়ানৌকো তো টলতে টলতে চলে—যদি নৌকোটা বেশ সোজা চলতে থাকে তাহলে চর্মচোখে দর্শন না পেলেও, মন কি বলে না যে, হালে কানাই ঠিক আছেন। রুশের দেশে কলির শেষে বোধ হয় জয়দেব কবির কথা আর খাটছে না,—হরির নাম বাদ দিয়েই তাঁদের গতি হয় বা।

একটা ছড়া কেটে ধর্মের কাহিনী শেষ করে আনা যাক :

নরের মিলন হলে মেলে নারায়ণ।
ফাঁকা নাম হাঁকে তাঁর দূরে পলায়ন।

ব্যক্তির হাতে সম্পত্তি রাখা নয়, কিছুতেই নয়, এই হল USSR-এর প্রধান নিষেধ। সম্পত্তি বলতে তাঁরা বোঝেন আবশ্যকের অতিরিক্ত জমানো মূলধন[১] যা দিয়ে পরকে খাটিয়ে নিজের বিলাস বাড়ানো যায়। সংসারে কারো অতিরিক্ত কারো অভাব হয়েই থাকে। যার যা উদ্বৃত্ত সবই থাকা উচিত সমবায়ের হাতে, যার যা অভাব পুরিয়ে সামঞ্জস্য রাখার জন্যে। দরকারের বেশি ধনে লোভ না রাখলে ঝঞ্ঝাট চিন্তা অনেক বেঁচে যায়, অতিরিক্ত উৎপন্ন মাল গতাবার গোলামচোরের খোঁজে ফিরতে হয় না। প্রত্যেকে অতিরিক্তের লোভ ত্যাগ করে সকলের সম্ভোগের বিধিমতো ব্যবস্থা করা, এই হল আদর্শ।

USSR দেখে শুনে বুঝে সাব্যস্ত করেছেন, মূলধন এক জনের হাতে জমতে দিলেই তাতে রিপুর বীজ এসে বসে, স্বার্থপরতার সার পেয়ে বেড়ে ওঠে, শেষটা সমাজকে গ্রাস করে। মূলধনের জড় মেরে দিলে, ধনী-দরিদ্রের ভেদ ; প্রবল-দুর্বলের আহার বিহারের ভেদ ; স্ত্রীপুরুষের আর্থিক অবস্থার ভেদ,—এ সব ঘুচে গিয়ে সমাজ পরিষ্কার হয়ে যাবে ; দলে, দলে, জাতে জাতে, মানুষে মানুষে আর ঝগড়া লাগবে না, মানব-হৃদয়ের যে স্বাভাবিক মৈত্রী তাই বিরাজ করবে।

ক্ষমতা অনুসারে[২] সকলকেই শ্রম করতে বাধ্য হওয়ায় শরীর মন তো সুস্থ থাকবেই ; তাছাড়া, পরের চাপে কি নিজের লোভে অতিরিক্ত খাটুনিতে শরীর না ভাঙলে, অনিশ্চিত অন্নের দুশ্চিন্তায় শুখিয়ে যেতে না হলে, পরস্পরের সুখ বাড়াবার চেষ্টায় নতুন জ্ঞান লাভ, নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করার যথেষ্ট অবসর থাকবে।

---

১ নিজের বা পরিবারবর্গের দরকারী জিনিস ভাঁড়ারে জমা রাখতে মানা নেই।

২ পালোয়ানকে দিয়ে কলার চর্চা, কিম্বা ভাবুককে দিয়ে লাঙল চালানো, কাজের এমন অদ্ভুত বাঁটোয়ারা হবে না, বলাই বাহুল্য

এ আদর্শ, এ মতামত মানলে, আজকাল যাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে, যার মধ্যে আমরাও জড়িয়ে পড়েছি, তার গোড়ায় কুড়ুলের ঘা পড়ে ; সেজন্যে য়ুরোপের মার্কিনদেশের লোকে, আর তাদের এ দেশের চেলারা তো USSR-এর উপর এত খাপ্পা। কিন্তু আমাদের দেশের সনাতন ভাবের তরফ থেকে এতে আপত্তি করার কারণ পাওয়া যায় না। ভোলানাথ অন্নপূর্ণার অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ভারতে প্রসিদ্ধ। সম্পত্তিতে রিপুর আবির্ভাবের ভয় সম্বন্ধে আমাদের দেশ বরাবরই সচেতন ; সেজন্যে ধনীকে সমাজের মাথায় বসানো হত না, ত্যাগীর উপদেশের বেশি মূল্য দেওয়া হত।

সুখভোগের স্বাভাবিক কামনা সকলের মধ্যে চারিয়ে দিলে তাতে অশান্তির সৃষ্টি হয় না, লোকহিতে রত থাকলে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, ভূমার মধ্যেই আনন্দ, এ ভাবের অনেক কথা আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সেগুলি সংসারের কাজের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। আমাদের দেশে না-ধর্মি অহিংসার এক সময় চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল, কিন্তু প্রাণ-দিয়ে মানব-সাধারণের ঐহিক ইষ্ট-সাধনের কোনো হাঁ-ধর্মি পন্থা এ পর্যন্ত কেটে বার করা হয়নি ; প্রজাপতির সন্তানমাত্রকে এক ডোরে বাঁধবার কোনো মহামন্ত্র উদ্ভাবন হয়নি।

বর্ণাশ্রম ধর্ম অবলম্বন করায় প্রত্যেক বর্ণের নিজের নিজের গুণ-কর্ম চর্চার সুযোগ হয়েছিল বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বেড়া ক্রমে শক্ত হয়ে ওঠায় এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে আসাযাওয়ার পথ খোলসা রইল না। দেখা গেল যে, অধিকারভেদ মেনে বসে থাকলে ভেদটাই টিঁকে যায়, অধিকার আর বাড়ে না। ক্রমশ বর্ণভেদের

জায়গায় জাতিভেদ চেপে বসল, গুণকর্মের বদল হলে যে ভেদটা বাধা হত না, সেটা জীবন থাকতে পার হবার উপায় বন্ধ হল।

তখন ধর্মের গায়ে লাগল আঘাত,—শুধু কর্তৃপক্ষের জবরদস্তির আঘাত নয়,শুধু ধর্মযাজকের ফরমাশি আঘাত নয়, ভেদের পর ভেদ বিনা প্রতিবাদে মেনে চলায় জাত-কে-জাত নিজের হাতে-দেওয়া আঘাতের অপরাধে লিপ্ত হওয়ায় সকলে মিলে সাজা পেলও তেমনি। কারো সঙ্গে মিলিনে মিশিনে করতে করতে হিন্দু জাতটাই হল একঘরে ; যারা পরের ভালো দেখতে পারল না, এখন তাদের ভালো কেউ দেখতে পারে না।

পরস্পর প্রীতি যে-পরম-ধর্ম তাকে চিনতে না পারায়, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার যে সনাতন উপদেশ, আমাদের দেশের লোক তার ঠিক তাৎপর্য পেল না। সম্পত্তি ত্যাগ করার মানে দাঁড়াল সম্পত্তি ছেড়ে পালানো। যে-রোগীর ওষুধ-পথ্যির খরচ জুটছে না, তাকে চেঞ্জে পাঠালে সে যেমন ধনেপ্রাণে মারা পড়ে, এতেও সে ধরনের ফল হল। বিষয়কে বিষময় যেমন বোঝা ওমনি স্ত্রীপুত্রকে তার মধ্যে ফেলে, গেরুয়া পরে গৃহস্থ দে পিট্টান, তাতে অন্য গৃহস্থদের গলগ্রহ হয়ে তাদের বিষাক্ত বিষয়ের ভাগ নিতে হয়, সে খেয়াল নেই। ভারতবর্ষেরই মধ্যযুগের সাধকদের জীবনে দেখা যায়, ঐহিক জীবিকার চেষ্টা পারত্রিক উন্নতি সাধনের বিঘ্ন নয়—তবে জীবিকা অর্জনে সন্তুষ্ট থাকা, আর লাভের লোভে মাতোয়ারা হওয়া, দুটো জিনিস আলাদা। শেষেরটা ত্যাগ করে প্রথমটা রাখলে নিজের জোরে থাকা যায়, কারও গলগ্রহ হতে হয় না।

পরের কাঁধে চাপার এ সহজ উপায়টি জাহির হওয়ায় মেকী-ও চলছে বিস্তর ; বিষয়ে যারা মোটেই বিরাগী নয়, তারাও ভেখ নিয়ে

রোজগারের দায় এড়ায়। কুম্ভমেলার সময় একজন গেরুয়াধারীর নিজের এষ্টিমেট শোনা গিয়েছিল— লাখে একজন সাচ্চা মেলে না। এতে দেশের অবস্থা যদি কাহিল হয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে।

আবার বলি, মিছে আক্ষেপ করার জন্যে এসব কথা তোলা হচ্ছে না। একজনের ফেল হবার কারণ বোঝা থাকলে অন্যের পাস হবার সম্ভাবনা যাচাই করা সহজ হয়।

"যে যার কর্মফল ভোগ করবে, আমি তার করব কী।—নিজের শান্তির চেষ্টা দেখি।"—এ ধারার নাম আর যাই হোক, একে প্রেমের পথ বলা যায় না। এর উলটো ভাব হচ্ছে USSR-এর। "যে যেমন ক'রেই ধরায় এসে থাকি, আমরা সকলেই ভবলীলার খেলুড়ে। এসো তবে, সকলে যাতে ভালো করে খেলতে পারি, পরস্পরকে সাহায্য করা যাক, খেলাটা ভালো করে জমিয়ে সকলে মিলে আনন্দ করা যাক।" একে অন্তত নিরানন্দের পথ বলা যায় না।

তবে নাম নিয়ে তো নয়, পরিণাম নিয়ে কথা। যে পথে লাখে একজন উচ্চ অবস্থা পেলেও পেতে পারে, আর বাকি সকলে দ'য় মজে, তার বিষম পাকের চেহারা তো আমরা চারিদিকেই দেখছি—গোড়ায় পুষ্টির অভাবে বলক্ষয়; বলহীনের বুদ্ধিনাশ, ঐহিক পারত্রিক উন্নতির পথ বন্ধ; শেষে রিক্ত আত্মার আরো বলক্ষয়। অন্যদিকে, ইহলীলা ভালো করে খেললে তাতেই শরীর মনের পুষ্টি, সেকথা কে না মানবে। ভালো করে খেলা মানে ভালোবেসে খেলা। প্রেমের গতি কেন্দ্রাতিগ; বাড়ার দিকেই চলে। আশেপাশের প্রেম উপরের প্রেমকে টেনে আনে, উপর থেকে প্রেম নামলে বিশ্বময় ছড়ায়। খেলা জমে উঠলে খেলানে-ওয়ালাকে দলে টেনে নিয়ে শেষে আরো বড়ো খেলা ফাঁদবার আশা

থাকে না কি। অন্তত এইটুকু জোর করে বলা চলে,—লীলাময়ের দেওয়া খেলা ফুর্তি করে খেললে তাঁর সঙ্গে ঝগড়ার কারণ হতেই পারে না।

আপত্তি করতে পার,— এসব ভারতবর্ষী ভাব রুশদেশ সম্বন্ধে খাটবে না। আচ্ছা বেশ, ওদেরই পাঁচজনের কথা একজনের জবানিতে, আমাদের সেই প্রবাসীর টোঁকা থেকে শুনিয়ে দেওয়া যাক। এক বিপ্লবী সমবায়-সম্পাদক বলছেন,—"মার্কিন দেশ থেকে যারাই আমাদের বিপ্লবের খবর করতে আসে, তারা জিজ্ঞেস করে—ওহে, তোমরা যে এত ভাবছ, এত খাটছ, যতই অসুবিধে হোক ভালো মনে সয়ে যাচ্ছ, এ কোন্ সম্পদ পাবার আশায়। তোমাদের নিজেদের পাওনা-থোওনার তো কোনো ব্যবস্থাই দেখছিনে।

"আমাদের উত্তর এই—তোমরা যে সব বিলাসের উপকরণকে সম্পদ বল, তা আমরা পাব না বটে, পাবার শখও নেই; পরের ঘাড়-ভাঙার যে ক্ষমতাকে তোমরা খ্যাতি-প্রতিপত্তি বলে থাক, তাও পাব না, পেলে নিতাম না; কিন্তু আমার গ্রামের ফসল বাড়ুক, আর হাজার মাইল দূরে খাল কেটে জলদানের ব্যবস্থা হোক, আমার পাড়ার কারখানা ভালো চলুক, আর অন্য প্রদেশের খনি থেকে রত্ন উঠুক, সব তা'তে আমার মনপ্রাণ ঝংকার দিয়ে ওঠে, কারণ আমি জানি, এ সব কোনো সম্পদ একজনের বা একদলের নয়, সমৃদ্ধি সকলেরই; আর সে 'সকলের' মধ্যে আমিও আছি, সুতরাং আমারই। এত বড়ো লাভের জন্যে যে কর্তৃত্বটুকু ছাড়তে হয়েছে, সে ত্যাগে কাঁটা নেই, তাতে সমবেত সম্ভোগের যে ফুল ফোটে তার রাষ্ট্রজোড়া সৌরভে আমরা নিশিদিন মাতোয়ারা। সোনায় গিল্‌টি করা লাগে না, ফুলে রং দিতে হয়

না, আমাদের আনন্দের লজ্জত বাড়াবার জন্যে সেকেলে ধর্মজীবীদের বাসী-বচনের পালিশ আবশ্যক নেই।”

আমরা গোড়ায় প্রশ্ন তুলেছিলাম—সমবায়ের হাতে সম্পত্তি থাকায় ব্যক্তিগত আর্থিক ঔদাসীন্য, পারমার্থিক উন্নতির বাধা হয় কি না। সম্পাদকের কথা যা শোনা গেল, তাতে বেশ বোঝা যায়, নিজের উন্নতির সঙ্গে সকলের উন্নতি জড়িয়ে গেলে ব্যক্তির উৎসাহ কম পড়ে না। যদি বল এ তন্ত্রে মার্কিন দেশের মতো অত বড়ো বড়ো কারখানা জন্মায় না, তার উত্তরে বলতে হয় USSR-এর সব কারখানাই তো এক প্রকাণ্ড কারখানার শাখা, সুতরাং আয়তনের দিক থেকে ধরলেও একদল নেতার হাতে এত বড়ো আয়োজন আর কোথাও দেখা যায় না।

কিন্তু আমরা সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, লক্ষ্মীর প্রসাদ বড়ো মজার জিনিস, তাকে ওরকম স্থূলভাবে মাপলে ঠকা হয়। তুলনা করতে হলে একদিকে রাখো প্রত্যেক সমবায়ীর কাছে সকলের আনন্দের যে ভাগ পৌঁছয়; অন্যদিকে রাখো সেই সমবায়ীর নিজের শ্রমের ক্লেশ। দাঁড়ি-পাল্লা তুলে ধরলেই মজাটা বেরিয়ে পড়বে। প্রথম দিকে দেখবে আনন্দকে ভাগাভাগি করে নিলে গণিতের নিয়ম মানে না, কমে না গিয়ে বেড়ে যায়। অন্যদিকে সুস্থ সবল শরীর দুশ্চিন্তারহিত মন দিয়ে যে শ্রম করা যায় তাতে তো ক্লেশই থাকে না, সেও আনন্দের পাল্লায় গিয়ে বসতে চায়।

এ চমৎকার ব্যাপার দেখো আর মনের আনন্দে জয়জয়কার করো। কার জয়? যে আনন্দ দিচ্ছে, যে আনন্দ পাচ্ছে, তোমার আমার মতো যারা সে আনন্দদৃশ্য দেখছে, সব উপরে যিনি আনন্দের মূল উৎস,—সকলেরই জয়।

পারমার্থিক উন্নতির কথা আর বেশি বাকি কি। বোঝাই তো গেল,

সংঘের কারণে ঘটা দূরে থাক্, বাধা আসে অভাব থেকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির রাজ্যে যে কৃতী তার একমাত্র লক্ষ্য সম্পত্তি বাড়িয়ে চলা,—ছেলে থাকলে বাড়াও, ছেলে না থাকলে বাড়াও, ছেলে ব'কে যাচ্ছে তবুও বাড়াও, ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়াও, মরতে মরতে বাড়াও—এ অবস্থায় আত্মার খবর সে কী রাখবে। আর যে অকৃতী, সে তো শুখোচ্ছে, আশায় আশায় শুখোচ্ছে, নিরাশায় শুখোচ্ছে, প্রবলের চাপে শুখোচ্ছে, অভাবে ক্ষীণ হয়ে শুখোচ্ছে—ঠাকুরদেবতার নাম ধ'রে আর্তনাদ করলে কী হবে, আত্মার সন্ধান তো দুর্বলে পায় না। বাড়তি কম্‌তি এই দুই বিষম অবস্থা থেকে সমবায়ে যে মুক্তি পেয়েছে, সে তো বেঁচে গেছে।

অতএব, সংঘের ভারে মানুষকে তরীর মতো উপরে ভাসিয়ে তোলে, জড়পিণ্ডের মতো তাকে তলিয়ে দেয় না,—এই রায় দিয়ে তৃতীয় বর্গের আলোচনায় বসা যাক।

স্বে মহিম্নি

অন্য সভ্য সমাজের তুলনায় USSR-এর বিধানে স্ত্রীজাতির অবস্থা ভালোমন্দ কেমন দাঁড়িয়েছে, সে খবর শ্রোতার কাছে ধ'রে দেওয়ার আগে যাকে বলে "নর-নারী সমস্যা" সেটা নিয়ে আপোশে একটু বোঝা-পড়া করে নেওয়া মন্দ না। বাস্তবিকই যত সব সমাজের উপর এ সমস্যাটা যেন ঝোড়ো অন্ধকারের মতো চেপে আছে, সমাজ-নেতারা কূলকিনারা ঠাওর পাচ্ছেন না। কিন্তু বলে রাখি, আমরা ভয়ভাবনায় মন ভার করে আলোচনায় বসছিনে।

শুধু মানুষের নয়, অনেক শ্রেণীর জীবের মধ্যে সন্তান উৎপাদন-লালন-পালনের ভার স্ত্রীপুরুষের উপর ভাগ করে দেওয়া আছে।

প্রকৃতির নিজের জন্মটা কিনা আনন্দ থেকে, তাই তিনিও সন্তানদের জীবনযাত্রায় আহারে বিহারে ব্যায়ামে বিরামে, পদে পদেই আনন্দের ব্যবস্থা করেছেন। বংশবৃদ্ধি কাজটা জীবনের ধারা চালাবার পক্ষে যেমন দরকারী, স্ত্রী-পুরুষের আনন্দের বরাদ্দটাও তেমনি বেশি।

যে কাজের সঙ্গে যে আনন্দ দেওয়া আছে, পশুরা তাই সাদাসিধে ভাবে উপভোগ করে। যেমন আহ্লাদ করে খায় দায় লাফায় ঝাঁপায় ঘুমোয়, তেমনি স্ফূর্তি করে যথাকালে জোড় বাঁধে, বাচ্ছা দেয়, তাদিকে খোরাক যোগায়, লায়েক হলে সংসারে ছেড়ে দিয়ে জীবনের এক পরিচ্ছেদ খতম করে।

লোভ মানুষকে পেয়ে বসায় তার এমন বদ অভ্যেস হয়ে গেছে যে, পরিচ্ছেদ ছেড়ে সে জীবনের কোনো প্যারাগ্রাফকে ফুরোতে দিতে চায় না। প্রকৃতিমায়ের দেওয়া আনন্দ যেখানে যা পাবার, এমন কি যেখানে নাও পাবার, ক'চলে বেশি করে আদায় করতে গিয়ে, জীবনটাই বিস্বাদ ক'রে ফেলে। ফলে দুর্ভোগী আর ফাঁকা-ত্যাগী দুই দলে সমস্বরে ফুকরে উঠে—"সবি ইঃ আর উঃ আর আঃ, জীবনটাই কিছু নাঃ!"

আহারের ব্যবস্থা দেখলে মানুষ-জাতের ভাবটা পাওয়া যায়। মুখে যেই খাবার ভালো লাগা, অমনি বুদ্ধি এসে বাতলায়—"একা জিভটার উপর সব চাপানো কেন, চোখ-রুচি সাজাও, নাক-রুচি গন্ধ লাগাও, কান-রুচি হাপুস্-হুপুস্ও যেন বাদ না যায়, তবে তো ষোলো আনা মজা পাবে।' সেই সঙ্গে রিপু জুটে ফোস্‌লায়,—"খিধের কম্‌তি থাকলে চাটনি; পেট ভার করলে হজমীগুলি।" রোমানরা ছিল বড়ো পাকা জাত। ভোজে একপ্রস্থ নতুন ব্যঞ্জন পরিবেশনের যোগাড় দেখলে, উঠে গিয়ে বমি ক'রে জায়গা খালি ক'রে আসত! এমন জাত কলির শেষে মুষলিনী প্রসব করলে কেন, যদুবংশের ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যেতে পারে।

এই সবই বুদ্ধির আড়ালে আদি-রিপু লোভের কেরামতি। রিপুটির ছদ্মবেশ ভেদ করে চিনে নিতে পারলে তার জারিজুরি আর খাটে না। জঠরের আগুন ওস্কাতে গিয়ে চিতার আগুনটা অকালে টেনে আনা না হয়, নিজের দাঁত দিয়ে নিজের গোর না খোঁড়া হয়, সে বিষয়ে মানুষে সাবধান হয়ে আসছে। আগে আগে ব্যায়ামে-বাড়ানো শরীরের বহর দেখিয়ে লোকে আস্ফালন করতে ভালোবাসত, এখন বুঝেছে মাংসপেশী ফোলাতে গিয়ে হৃৎপিণ্ড ফেল্ পড়তে পারে। প্রভুত্ব যতই মিষ্টি লাগুক, আজকাল বিপ্লবের ছায়া যেখানে-সেখানে যেরকম উঁকিঝুঁকি মারছে, তাতে যা রয়সয় তারি মধ্যে কর্তারা নিজেকে সংবরণ করতে শিখছে।

কিন্তু নরনারী-সমস্যা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে তো বাড়ছেই,— তার মানে ওটা একা রিপুর পাকানো ফ্যাসাদ নয়, ওতে মিত্রেরও হাত আছে। এ রকম জটিল জিনিসকে ছাড়িয়ে দেখা দরকার, নইলে জটের প্যাঁচে বুদ্ধিটাও জড়িয়ে যেতে পারে। হ'লে কী হবে, এ সমস্যার কথা উঠলে লোকে হয় গদ্‌গদ, নয় জড়সড়, নয় আগুন হয়ে ওঠায় ওর খেইগুলো আলাদা ক'রে ধরাই যায় না। আচ্ছা, হয় না তো কী হয়েছে, আমরাই ঠাণ্ডা মনে বিচার করলেই তো চুকে যাবে।

রিপুর হাত কোথায় ভাবতে গেলে দেখা যায়, নারীকে নরের সম্পত্তি বানিয়ে দিয়ে সে এক আঁচড়েই কর্ম সারা করেছে। এখন সমাজের যে স্তরেই দেখ, সেই অঘটনের ক্রিয়া চলছে।

আসুরিক স্তরে পুরুষটা প্রণয়িনীকে ঘাড়ে ধরে নিজের আড্ডায় টেনে নিয়ে যায়, সেখানে তাকে দিয়ে দাসীগিরি, রাঁধুনি-গিরি, মা-গিরি সব করায়। স্ত্রীলোকটা ভর্তার কাছে পেটভাতা পায়, তাছাড়া সে এটাও বোঝে যে, ছুটো থেকে পশুপতির থাবা খাওয়ার চেয়ে মানুষ-

পতির চড়টা চাপড়টা মন্দের ভালো, তাই চুপচাপ না থাকলেও, তার ঘরে টিকে থাকে ঠিক।

পৈশাচিক সমাজে শৌখিন নর-পুঙ্গব তার অর্থ-সামর্থ্যে যে পর্যন্ত কুলোয়, ততগুলি রমণীরত্ন সে সংগ্রহ করে। অবলা মানুষ নিরাশ্রয় থাকলে পাঁচ জনের মন যুগিয়ে তাকে চালাতে হত, তার চেয়ে এক জনকে খুশি করে যদি খাওয়াপরা সাজসজ্জা আরামে পাওয়া যায় মন্দই বা কী, তাই এ অবস্থায়ও সে পোষ মেনে থাকে, এমন কি কামিনীগিরি প্র্যাক্‌টিস ক'রে কিছু সুবিধেও ক'রে নেয়।

আসল বাঁধন ধর্মের ফাঁদে। শাস্ত্রে-আইনে মিলে ইহকাল পরকাল জড়ানো শিকল বার করেছে। তন্ত্রমতো মন্ত্র একবার আওড়ে ফেললে কনের আর ছাড়ন-ছোড়ন নেই। গৃহকর্তা বেঁচে থাকতে তার ঘরের, তার কুলের, তার শখসাধের প্রসঙ্গ নিয়েই জীবন, পতিদেবতা মারা গেলেও নিজেকে ভুলে তার ধ্যানে মশগুল থাকতে হয়। পুরস্কার কী,—না "সতী" খেতাব। আর পায় কে? ধর্মের সিঁদকাঠির মতো উঁচু অঙ্গের মন চুরী করার উপায় আর নেই, স্বাধীন বিচারের মাথা ঐখানেই খাওয়া গেল। জীবন উৎসর্গ তো তুচ্ছ কথা, সতী বললে পতিব্রতা আগুনেও ঝাঁপ দিতে রাজি।

আজকালকার রুচিতে এ সব অবস্থার কোনোটাই যদি ছেলে-মেয়েদের মনে না ধরে, তাতে তাদের অপরাধ কী। যে ভাবে হোক ভয় দেখিয়ে, ঘুষ খাইয়ে, বোকা বুঝিয়ে—স্ত্রীজাতিকে মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তা'তে তার হালটা কী দাঁড়ায়। নিজেকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে স্ত্রীকে ঘুরিয়ে যে পুরুষ সন্তুষ্ট থাকে, তার সেই সংকীর্ণ মনের মাপে সেই ঘরের বউ, সেই কুলবধূকে খাটো হয়ে থাকতে হয়।

তারপর সেইমতো ছাঁটাই নারীকে শক্তিরূপিণী বলে হাজার খোশামোদ করলেও, সে কোনো বড়ো কাজ করার শক্তি পাবে কোত্থেকে।

ছেলেকে মেষ না করে মানুষ করা, সংসারকে গারদ না করে লীলাঘর করা, আগামী কৃতযুগ আবাহনের আয়োজন করা,—নরনারী নিজ নিজ মহিমায় মিললে তবেই এ সবের আশা থাকে, কিন্তু আমরা যতগুলি সম্পত্তি-পাগল সমাজ জানি তার মধ্যে সে সম্ভাবনা কোথায়।

বলা হয়েছিল নরনারী সমস্যার মধ্যে মিত্রেরও হাত আছে। সে রহস্যটাও এবার খুলে দেখার চেষ্টা দেখা যাক।

প্রারম্ভে শ্রোতাকে সেই খাঁটি প্রেমের কথা মনে করিয়ে দিই, আনন্দলোকের সঙ্গে যে প্রেম মানুষকে যোগ ক'রে রাখে, যার ধারা একেবারে ছেড়ে গেলে মানুষ ঘোর অন্ধকারে তলিয়ে যায়। এ প্রেমের প্রকার বা ক্রিয়া এ বর্গের মধ্যে আলোচনা হতে পারে না, তবে আমাদের কথাটা ফোটাবার জন্যে যেটুকু দরকার তাই বলা যাক।

বিশুদ্ধ স্বাধীন ভাবই খাঁটি প্রেমের বিশেষ লক্ষণ। সংসারের কাজে এ প্রেম আমাদের সহায় নয়; এর প্রভাবে মা-বাপ সন্তানকে কোলে-পিঠে নেয় না, দম্পতি সোহাগ করে না, সন্তান মাবাপের নেওটো হয় না। স্নেহ মমতা ভক্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই,—এক নিছক সখ্যের মধ্যে সংসারে একে দৈবাৎ পাওয়া যায়। গুরু-শিষ্য, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, নর-নারী এ সব ভেদে এ প্রেমের বাধা ঘটে না, বড়ো জোর রং বা সৌরভের কিছু রকমারি হতে পারে। প্রয়োজন বা সম্বন্ধের দাবি এর অন্তরায়। এর আকর্ষণে মানুষ মানুষকে টানে কিন্তু বাঁধে না। আপাতত আমরা যদি মেনে নিই যে, এ রকম প্রেম কদাচ লাভ হলেও, এখন জগতে আছে, তাহলেই এ বর্গের আলোচনার কাজ চলে যাবে।

যেখানেই পাঁচরকম সাংসারিক ভালোবাসার সঙ্গে এই মুক্ত প্রেমকে

গুলিয়ে ফেলা হয়, সেখানেই বুদ্ধিবিপাকে পড়ে একটা না একটা সমস্যা পাকিয়ে উঠতে চায়। তাই এক পত্তন সাংসারিক ভাবগুলিকে ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে সাদা বুদ্ধির আলোতে তুলে ধরে, মাথাটা ভাষাটা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। বাঁধি গৎ নিয়ে গ'লে থাকলে চলে না। খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে কোনো ভাবের অপ্রচলিত চেহারা বেরিয়ে পড়লেও তাতে ভয় পাবার কিছু নেই।

প্রথমে ধরো স্নেহ। এ কথাটা বেশ। যে ভাব মায়ের বুকে দুধ টেনে আনে, যেভাবে ছেলেকে কোল ধরে মা-বাপে আদর করেন, সাজান গোজান, খেলেন খেলান,— স্নেহ তার উপযুক্ত নাম। অপর পক্ষে, স্নেহের বিনিময়ে যে মিষ্টি রস মা-বাপ আদায় করে নেন, ছেলেকে পালন করার পরিশ্রমের তাই তাঁদের পুরস্কার,— বড়ো হয়ে ছেলে কৃতজ্ঞ হবে তার অপেক্ষা দুনিয়াদারির অভ্যেসে মা-বাপ করতে পারেন, কিন্তু স্নেহতে তা করায় না। এই পুরস্কার প্রাণ ভরে উপভোগে কোনো দোষ নেই যদি মনে রাখা যায় স্নেহের স্বাভাবিক আয়ু শিশুকালের সীমার মধ্যে পরিমিত। শিক্ষাদীক্ষার সময় এলে স্নেহের জায়গায় মিত্রতা আসার দরকার, নইলে বুড়ো ছেলেকে আঁচল-বাঁধা করলে, কিংবা নিজের মনের মতো তার স্বভাবকে মোচড়াবার চেষ্টা করলে, না ছেলের না মা-বাপের পক্ষে ভালো।

সে যাই হোক, আমরা যে বন্ধনহীন প্রেমের কথা বলছিলাম, এ পরিমিত বাৎসল্যবৃত্তি সে প্রেম নয়। তবে স্নেহভক্তির জঞ্জাল যথা-কালে কাটিয়ে উঠতে পারলে, মা-বাপ ছেলেমেয়ের মধ্যে সেই অহেতুকী প্রেমের সঞ্চার হতে পারে না, এমন কোনো কথা নেই।

ভক্তি জিনিসটা কিন্তু অদ্ভুত। শ্রদ্ধাতে ভক্তিতে তফাত এই যে, সত্যিকার কোনো গুণ অনুভব করলে, অন্যদোষ দেখা সত্ত্বেও শ্রদ্ধা আপনি

আসে, তার জন্যে ঢাকঢাক গুড়গুড় লাগে না। গুণ আরোপ করে, দোষ চাপা দিয়ে তবে ভক্তি আনতে হয় ; বিগ্রহে যেমন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, স্তবস্তুতি দিয়ে বাড়িয়ে না তুললে তার পুজো চলে না। এইজন্যে মা-বাপ সম্বন্ধে ছেলেপিলের যে স্বাভাবিক ভাব, তার নাম "ভক্তি" দিতে আমরা নারাজ। যাঁদের আত্মসম্ভ্রমবোধ আছে এমন কোন্ মা-বাপ ছেলেদের কাছে মেকি দেবতা সেজে থাকতে চান। পাকা বুদ্ধি বা উদার হৃদয়ের গুণে কোনো মা-বাপ যদি ছেলেদের শ্রদ্ধা পান, ভালোই ; না পেলেই বা কী। নিজেদের দোষে না খোয়ালে, সব মা-বাপ নিশ্চয়ই ভালোবাসার অধিকারী। ভালোবাসায় যার কুলোয় না, ভালোবাসা কী সে তা জানে না।

এত কথার পর বলাই বাহুল্য আমরা যে প্রেমের কথা বলছিলাম, ভক্তির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

এবার আসল কথায় আসা যাক। যে স্বাভাবিক টানে যুবকযুবতী প্রজনার্থ পরস্পরকে চায়, তার নাম দেওয়া যাক প্রণয়। এই প্রণয়ের সহজ রাস্তায় সকারণে অকারণে মানুষ নানা বাধাবিঘ্ন এনে ফেলেছে,— সমাজের বিধিনিষেধ, দুই পক্ষের মা-বাপের ইচ্ছে অনিচ্ছে, টাকাকড়ি নিয়ে টানাটানি, আরও কত কী। ফলে, সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক প্রণয় অনুসারে পরিণয় বড়ো একটা ঘটে না, বিয়ের পর যেটুকু প্রণয় গজায় তাই নিয়েই দম্পতিকে ঘর করতে হয়। প্রণয়ের স্বাভাবিক স্থান গৃহের মধ্যে, ওর স্বাভাবিক আয়ু গৃহস্থাশ্রমেই শেষ। স্বস্থানে ওকে না রাখলে এক পত্তন ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয় ; তার উপর ওকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ওর মধ্যে যা নেই তা আদায়ের চেষ্টা করলে, শরীর মনের স্বাস্থ্য তো নষ্ট হয়ই, তার উপর যেটা ছিল মাত্র ফ্যাসাদ সেটা সমস্যা হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির জীবধারা-রক্ষার উপায় যে দৈহিক প্রণয়, আর মানবাত্মার মহাযাত্রার পাথেয় যে বিদেহী প্রেম, এ দুইয়ের মধ্যে মানুষের মনে অনেককাল থেকে যেন একটা গোল পাকিয়ে রয়েছে।

কবি যখন বিলাপ করলেন— লাখো যুগ ধরে হিয়ায় হিয়া রেখে জুড়োনো গেল না, তখন এ সহজ কথাটা তিনি কি ভুলেছিলেন যে, হিয়ার মিলনের আনন্দের রেশ ক্ষণ-কয়েকের বেশি থাকে না?—তা তো সম্ভব নয়, তবে কী ভেবে তিনি তাতে যুগ-ভরা আশের কথা তুলেছিলেন। মনে হয় তাঁর প্রিয়া তাঁর সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক স্তরে ছিলেন না, তাই কাছাকাছি আসার কারণে আত্মায় আত্মায় যে স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করতেন, সেটা সত্যিকার প্রেমের মিলন পর্যন্ত পৌঁছতে পেত না,— না পেলেও কী-যেন-হলে-হতে-পারত, কী-যেন-হয়েও-হল-না এ রকমের অস্ফুট আক্ষেপ কবির গভীরে রয়ে যেত।

যবন-দার্শনিক Plato এই বিদেহী প্রেমকে আলাদা করে চিনে-ছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু সে দেশেরই হোক, এ দেশেরই হোক, সেকেলে কবিরা সম-স্তরের সঙ্গীসঙ্গিনী না পাওয়ায়, বা যে কারণেই হোক, তাঁদের আদিরসের গুণগান দেহের বন্ধন ছাড়িয়ে উঠত না। অথচ আসল প্রেমের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ছিল নিশ্চয়ই, তাঁদের রচনাশক্তির তো কথাই নেই, তাই তাঁদের সোনার কাঠির পরশে তাঁরা প্রণয়কেই গিল্‌টি করে দিয়ে গেছেন। তাঁদের আধুনিক জাতভাইরাও অনেকে সেই কাজে লেগে আছেন।

ফলে, সাহিত্যজগতে প্রণয়কে যে রং চড়িয়ে রাখা হয়েছে, তাতে মানুষের বাস্তব জীবনে অনেক অলীক সাধবাসনা জেগে ওঠে, যার তৃপ্তির উপায় সাহিত্যেও দেখানো নেই, ভুল পথে খুঁজে পাঠকরাও পায় না, কাজেই হতাশ হয়, হা হুতাশ করে, নানা জালে জড়ায়। প্রণয়কে

অতি উঁচুতে তুলতে গিয়ে গোলটা বেধেছে ব'লে তাকে মিত্রের মার বলা হয়েছিল।

তবে কি না, মিত্রের উপর রাগ করা দূরে থাক্, আমরা রিপুকেও বন্ধু করে নেওয়ার পক্ষপাতী। সব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আহারের ব্যাপারটা পরিপাটী করে আনা, সে তো সভ্যতার একটা উজ্জ্বল কীর্তি। রিপুকে ভয় করার কোনো কারণ থাকে না, যদি রুচিকে হামেশা বুদ্ধির সাথী করে রাখা যায়। হাজার চমৎকার পশমী কাপড় যেমন ভাবুনে মহিলারও গরমী কালে গায়ে চড়াবার শখ হয় না, তেমনি খাবার বিষয়ে অখাদ্যে সহজ অরুচি বুদ্ধির সাহায্যেও চর্চা করা যায় না কি।

প্রণয় সম্বন্ধে ভাবুকের ভুলটা বুঝে চলতে পারলে তার দোষও আপনি কেটে যাবে।

নন্দনকাননে যুগল ভ্রমণ, চাঁদনীর লজ্জত, পাখির তান, ফুলের সুবাস, দখিনে বায়, দুঁহু দোঁহার পানে চাওয়া, এসবে যার প্রাণ না মাতে, এর এককণা রস যে বাদ দিতে চায়, তাকে তো আকাট বেরসিক বলি। ওদিকে, এক বাসা, এক জীবিকা, একই সন্তানসন্ততি আত্মীয়কুটুম্ব নিয়ে ঘর করেও যে-দম্পতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বা অন্তত রফারফি না হয়ে যায়, তাদিকে বেধড় বদমেজাজী বলি। কিন্তু কথক হলেই কথা নিয়ে পিটপিটে হতে হয়, তাই আপত্তি করি,—যতই চমৎকার হোক, এসবকে প্রেম বলা কেন।

তবে কি প্রণয়ীদের মধ্যে প্রেম হয়ই না। ধাপে ধাপে উঠতে পারলে হতে পারে বইকি।

প্রজনার্থ প্রণয় (দেহের মিলনে ইন্দ্রিয়সুখ-বিনিময়)।

সহবাসে ভাব (মনের মিলে চিত্তবৃত্তির বাণীবিনিময়)।

সহধর্মে প্রেম (আত্মার একীকরণে সত্তার আনন্দবিনিময়, যার ভাষা

কবি শেলি দিয়েছেন : সত্তায় সত্তা মিশে যাওয়া (in one another's being mingle)—যদিও পাশ্চাত্ত্য পাঠকরা এ ভাষার সে মানে ধরেন কিনা সন্দেহ)।

এই ধাপ ধরে উঠলে প্রণয়ীযুগল চরম অবস্থায় পৌঁছতে না পারবে কেন। কিন্তু বিয়ের মন্ত্রপড়াগোছের কোনো কৃত্রিম তুকতাকে প্রেম হয় না ; তাছাড়া, না হতেই হয়েছে মনে করায় বা বলায় লাভই বা কী। তাতে উলটে প্রেমের পথে বাধা পড়ে।

এই ভূমিকার পর নরনারীসমস্যা আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রকৃতির নির্দেশমতো বরকনের মিলনের পথে জাতকুলমেল যত রকমের বাধা ছিল, তার মধ্যে ক্রমশ প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে টাকা। তার প্রথম ফল এই যে, যে-ছেলে সুবিবেচক, দূরদর্শী, সে বিয়ে করছে না, যারা ছ্যাব্‌লা, কাণ্ডজ্ঞানরহিত, তারাই নিখাকী বংশ বৃদ্ধি করে অশেষ যন্ত্রণার সৃষ্টি করছে। সমাজের গতি তাতে নিচের দিকেই চলেছে।

যথাকালে উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর বিয়ে না হওয়ায়, প্রকৃতির তাড়নায় নানা সামাজিক উপসর্গও দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সামান্য ত্রুটির সোজাসুজি সংশোধন না করে তার উপর মহাপাতকের বোঝা চাপিয়ে প্রণয়ঘটিত অপরাধের এমন ভীষণ মূর্তি খাড়া করা হয় যে, সাহায্য করতে কেউ এগোয় না, খালি সাজার কথাই ভাবে। কিন্তু যতই রাগ হোক, সমাজ তো শক্তের বাঘ হতে সাহস পায় না, কাজেই যে অবলা আইনের আশ্রয় পায়নি, যে শিশু বিনামন্ত্রের আমন্ত্রণে ধরায় এসে পড়েছে, চোটপাটটা তাদের উপরেই গিয়ে পড়ে। নরনারীসমস্যা তো নয়, অবলা শিশু-সমস্যাই বলতে হয়। সমাজের ক্ষয়ের এই অপর কারণ।

সমাজবৃদ্ধেরা কপাল চাপড়ান, পাহারা কড়া করেন, সাজা বাড়াতে

বসেন,—অপরাধের জড়-মারার ভাবনা ছাড়া আর সবই ভাবেন। জড় মারার উপায় করছেন USSR-এর বিপ্লবীরা।

এক বিষে, এক ভুলে যদি নরনারী-সম্বন্ধ অসুস্থ হয়ে থাকে, তাহলে এক ওষুধেই বা স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পারা যাবে না কেন—ব্যক্তির হাতে সম্পত্তি থাকায়, মানুষের সমানভাবে খাওয়া-পরার, স্বাভাবিকভাবে মেলামেশার যেসব অন্তরায় হয়ে থাকে, সমবায়ের হাতে সম্পত্তি এনে ফেলায় এক বিধানে সে সব উড়ে গেল। নারীও আর সম্পত্তির কোঠায় রইল না, সে হল সব বিষয়ে নরের সম-অধিকারী।

মানুষ হল অর্ধ পশুদেব ; এই জোড়া-স্বভাবের দোটানায় পড়ে তার যত গোল বাধে। যেসব দেহসুখ পশুরও আছে মানুষেরও আছে, একদিকে সেগুলো সাদাভাবে ভোগ না করে বুদ্ধির জোরে জবরদস্তি বাড়াবার যেসব দুর্ভোগ, তার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। অন্যদিকে মানুষ পেয়েছে ডেপুটিস্রষ্টার পদ, সৃষ্টিকাজেই তার মানুষের উপযুক্ত উঁচুদরের আনন্দ পাবার উপায়, সৃষ্টির নব নব উন্মেষে তার ব্রহ্মাস্বাদের ভূমানন্দ পর্যন্ত পাবার উপায় আছে।

কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর চলছে যে-আধুনিক সভ্যতা, তার হুড়োহুড়ির চোটে শ্রান্ত-ক্লান্ত গৃহস্থের সৃষ্টি কাজের অবসর কোথায়। তাই সে নিশিদিন অবসাদে ডুবে থাকে, তাই জলে-পড়া লোক যেমন কুটোটা-কাটাটা আঁকড়ে ধরে, সে-ও তেমনি সহজে-পাওয়া-যায় যে-ইন্দ্রিয়সুখ, সময়ে-অসময়ে স্থানে-অস্থানে তাই নিয়ে টানাটানি করে। অহরহ অন্নচিন্তার জ্বালা থেকে সে যদি নিস্তার পায়, উচ্চ-আনন্দলাভের আস্বাদ পায়, সে কি সস্তা সুখের শান্তিভোগের ধার দিয়ে আর যেতে ইচ্ছে করবে।

যা হোক, একে একে দেখাই যাক না, সংঘবদ্ধ হলে প্রকৃতির দেওয়া স্বাভাবিক সম্বন্ধগুলোর কী অবস্থা দাঁড়ায়।

আমরা তো দেখেছিলাম, পরিবারের মধ্যে বদ্ধ থাকলে স্নেহের স্বাভাবিক আয়ু ফুলের মতো অল্পকাল স্থায়ী, টেনে রাখতে গেলে ফল খারাপ হয়। সমবায়ের হাতে পড়ে, আয়ু ঠিক রেখেও, পরিসর বাড়িয়ে স্নেহকে বিরাট করে তোলা হয়েছে। যে নারীর যেমন মাতৃ-ভাবের জোর, সে ধাপে ধাপে নিজের ছেলেদের মা, সমবায়ের ছেলেদের মা, রাষ্ট্রের ছেলেদের মা হয়ে উঠতে পারে,—তার জন্যে শুধু যে দরজা খোলা তা নয়, সত্যিকার মায়ের সন্ধান পেলে রাষ্ট্রনেতারা তাঁকে আদর করে ডেকে নিয়ে বড়ো করে তোলেন।

সর্বঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবানকে তাঁর দেওয়া ভোগ্যবস্তু ফিরে নিবেদন করার যথার্থ তাৎপর্য কী হতে পারে। যে মানুষ প্রসাদের অধিকারী, সে অনধিকারীকে নিজের আসনে তুলে নিয়ে ভাগ দেবার চেষ্টা করলে সেটা বরং বেশ দিলারাম দৃশ্য হয়। তেমনি, মা-বাপকে সন্তান প্রতিদান কিবা দিতে পারে। মা-বাপের কাছে পাওয়া যা কিছু ভালো জিনিস, সুদসুদ্ধ সেগুলো তার নিজের ছেলেপিলেকে বুঝিয়ে দিয়ে তবেই তার পিতৃমাতৃঋণ শোধ হতে পারে।—বিপ্লবী বিধানের এই ভাব।

আর ভক্তি?—রাষ্ট্রপতিদের উপর ভক্তির চর্চা যেভাবে চলে চলুক, কিন্তু USSR-এর সমাজে আপনা-আপনির মধ্যে তার জায়গা কোথায়। যেখানে মাথা খাড়া রেখে নরনারী পরস্পরের চোখের দিকে সোজা চাইতে শিখেছে সেখানে সব দৃষ্টিই শুভদৃষ্টি, সেখানে কামভীতু লক্ষ্মণ-দেওরের মতো ভাজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকা লাগে না; সাধ্বী-নাম-পিপাসী সহধর্মিণীকে পতির দেবত্ব তল্লাশে কপালে চোখ ওঠাতেও

হয় না। বিপ্লবীসমাজে পুরুষকে পতি খাড়া করা হয়ই না, ছেলেকে মানুষ করে তোলাই মনে করে সাধু-সাধ্বী উভয়েরই ধর্ম।

বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা মা-বাপের পায়ের ধুলো চায় না, চায় অনেক-সওয়া চিত্তের সরসতা, অনেক জানা মগজের সার,—মা-বাপেও তাদিকে তাই দিতেই ভালোবাসেন। যখন জরা এসে তাঁদের পায়ে ধরে, তাঁরা তখন নবীনের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে দ্রষ্টার আসনে নেমে এসে শোভা পান। সে শোভা যে দেখে সে খুশি হয়, ভক্তির কোনো প্রসঙ্গই ওঠে না।

শেষ কথা, এ সমাজে প্রণয়ের অবস্থা কী রকম।—খুব সোজা। নারীর দিক থেকে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে।

প্রকৃতির ঠেলায় নারী তো যথাকালে ছেলের বাপ পছন্দ করে নেবে। এ বিষয়ে কোনো বিধিনিষেধের হাঙ্গাম, বা ভরণপোষণের ভাবনার চাপ না থাকায়, তার লুকোচুরি রংঢং কিছুই করা লাগে না, পছন্দটা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে করতে পারে; তার জন্যে কারো সঙ্গে যেচে আলাপও করতে হয় না, কারণ কর্মসূত্রে সমবায়ী নরনারীদের নিয়মিত দেখাশুনো মেলামেশা চলতেই থাকে। শেষে যাকে নির্বাচন করে তার সঙ্গে শিষ্টালাপ করে, মিষ্টালাপ করে, বন্ধুত্ব করে, সোহাগ করে; কিন্তু তাকে স্বর্গের দেবতা মনে ক'রে, বা তার সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ কল্পনা ক'রে, নিজেকে ভোলায় না।

পরের পছন্দে বিয়ে করতে হলে যে সকল ভুলভ্রান্তি আকছার হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে সেগুলো থেকে দম্পতি অনেকটা রেহাই পায়; তবে নিজের কাঁচা বয়সের বাছাইতেও মাঝে মাঝে গলতি থেকে যায়। তাতে ভয় কী। পর্বতপ্রমাণ ভুল হলেও স্বীকার করলে শুধরে নেওয়া যায়। যার বাইরের চিকনচাকন দেখে মনে ধরেছিল, ঘর করার বেলা যদি তার

ভিতরের খড় বেরিয়ে পড়ে, তবে মুখ ভার না করে ভালো মনে আবার আলাদা হওয়াই তো ভালো। "প্রাণ যায়, তবু ধরেছি তো সেঁপ্টে থাকি।" এ ভীষণ পণে বাহাদুরি থাকতে পারে, সুমতির পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষত ছেলেদিকে সামলে দেবার জন্যে যেখানে সমবায় রয়েছে।

নারীর দিক থেকে যা যা বলা গেল, নরের দিকে সবই খাটে। নির্বাচন তরুণ-তরুণী পরস্পরকে করে,—এক হাতে তো তালি বাজে না।

এ সম্পর্কে USSR-এর সমবায়-নেতার কথাটা এই :

"শোনো, ছেলেমেয়েরা! তোমরা কে কার সঙ্গ কর, বা ছাড়, সে বিষয়ে তোমরা স্বাধীন। কিন্তু খবরদার। ছেলে যদি জন্মায়, তার যেন স্বাস্থ্যের, শিক্ষার, আনন্দের ব্যাঘাত না হয়, সে বিষয়ে যদি ত্রুটি ধরা পড়ে, তবে পঞ্চায়েৎ ঘাড়ে ধরে তোমাদিগকে সায়েস্তা করবে।"[১]

স্ত্রী-পুরুষের এ ভাবের মিলনে অনেকে আপত্তি করেন—"ভগবানকে তো সাক্ষী করা হয় না।" ভগবানকে সাক্ষী না ক'রে কেউ কোনো কাজ করতে পারে, আস্তিকের পক্ষে এ কল্পনাটা আমাদের একটু অদ্ভুত লাগে।

আঁদ্রে গীদ্ ব'লে একজন বিখ্যাত ফরাসী কবি এই শেষ যুদ্ধের আগে রুশ দেশে গিয়ে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে শ্রমিকদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। লোকে বলে তিনি আগে যত USSR-এর পক্ষপাতী ছিলেন, এখন তা নন। লোকের কথায় কী হবে, তিনি নিজে যা বলেছেন চুম্বকে কিছু বলি শোনো। "কারখানায়, মাঠে, কাজের সময়

১ মাবাপের ছাড়াছাড়ি হলে পঞ্চায়তে ঠিক ক'রে দেয় কোন্ পক্ষ ছেলেকে কাছে রাখবে, কোন্ পক্ষকে খরচের কত ভাগ দিতে হবে।

হোক ; আর, ছুটির সময় বাগানে বেড়াতে গিয়ে হোক ; USSR-এর শ্রমিকের দলে যেখানে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছি,— কবি ভাইদেরও শ্রমিকের দলেই ধরছি,— আমার মনে এক অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ উঠেছে। তাদের মুক্ত জীবনের ছোঁয়া পেয়ে, আমার মধ্যেও কী যেন একটা বাধা সরে গেল, দরদের ফোয়ারা ছুটল, কখনো বা চোখে আনন্দের জল ঠেলে উঠল। তাই দেখতে পাবে আমার রুশে-তোলা ছবিতে এমন একটা দিলদরিয়া হাসি ফুটে আছে, দেশের ছবিতে যার লেশও নেই।

"আর ছেলেদের আড্ডায়,—হঠাৎ তাদের একটা চড়িভাতিতে গিয়ে পড়েছিলাম—কী আনন্দের জেল্লা তাদের মুখ আলো করে ছিল। সুস্থ পুষ্ট পরিচ্ছন্ন শরীর, তাদের বিশ্বাস-ভরা অসংকোচ চাউনি যেন নিজের আনন্দের ভেট আমায় দিতে এগিয়ে এল। তাদের ভাষা জানিনে, জানার দরকারও বোধ করিনি। তারা আমায় বন্ধু ব'লে চিনলে, তাতেই আমার মন কেড়ে নিলে, তার উপর কথায় বলার কী থাকতে পারে।

"তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও সেই সরল হাসি, সহজ আনন্দ। প্রমোদ উদ্যানে গিয়ে দেখি তারা নানা আমোদে মেতেছে, কিন্তু কী শ্লীলতা, কী সংযম। ইতরতা নেই, ছ্যাবলামি নেই ; হাসিতে নিছক ফুর্তি, খোঁচার ভাব, বিদ্রূপের ভাব, কারো মনে কষ্ট হতে পারে এমন কোনো ভাবই নেই। খেলার আয়োজন, ব্যায়ামের আয়োজন, নাচের আয়োজন, এসব তো আছেই, তার উপরে জায়গায় জায়গায় ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়ে বক্তৃতাও চলেছে ; যারা শুনছে পুরো মন দিয়ে শুনছে, যারা অন্য আমোদ চায়, তারা অশিষ্টতা ক'রে রসভঙ্গ করছে না। সকলের জায়গা যেখানে নাও কুলোচ্ছে সেখানে ঠেলাঠেলি নেই, পালায় পালায় ঢোকার জন্যে প্রসন্ন মনে বাইরে অপেক্ষা করছে। তাই,

লোকারণ্য হলেও হট্টগোল নেই। উৎসব থেকে যেন একটা প্রশান্ত আনন্দ উঠে আকাশ ভরে রেখেছে।"

একজন ফরাসী বন্ধু টিপ্পনি কেটেছিলেন—"এত অকাল-গাম্ভীর্য কি ভালো। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফচকেমি নেই, টিটকারি নেই, কথা-কাটাকাটি নেই,—বয়স হলে এরা কি স্বাধীন বিচার করতে পারবে, না ধামাধরার দল তৈরি হবে।"

তার উত্তরে লেখক বলছেন, —"এদের অকাল বার্ধক্য নয় গো— অকাল-যৌবন। যাদিকে তরুণ-তরুণী বলছি তারা যে-বয়সে যৌবনের ফূর্তি টেনে রেখেছে, তাতে আমাদের দেশে বুড়িয়ে বসে যেত।" বাস্তবিকই সত্যিকার গাম্ভীর্য যৌবনানন্দেরই জিনিস, জরার শিথিলতায় তাকে পাওয়া তো যায় না।

আমাদের আরো মন্তব্য এই—সমাজবৃদ্ধেরা সর্বদা আশঙ্কা করেন, নারীকে নেপথ্য গারদের বাইরে ছাড়া রাখলে, ইচ্ছেমতো চলতে ফিরতে দিলে, সমাজ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।—ইচ্ছেকে তাঁরা কত ভয় করেন "যাচ্ছে তাই" কথাটার দুর্দশা থেকেই মালুম দেয়। কিন্তু কই—USSR এ-তা তো হল না। হবেই বা কেন। ননী খাওয়ার মানা না থাকলে ছেলে তো ননীচোরা হয় না। আমরাও এককালে ছেলেমানুষ ছিলাম,—মনে পড়ে, বারণ না থাকলে দুষ্টুমিও বোদা লাগত।

যারা বন্ধুত্বের তাজা রস চাইলেই পায়, কামের পচা ভোগ তাদের রুচবে কেন। যারা দুশ্চিন্তামুক্ত, সারাদিন হিত কাজে রত, শয়তান হোক শনি হোক, তাদিকে বদবুদ্ধি দেবার ফাঁকই পায় না।

এ বর্গের শেষ প্রশ্ন এই— স্বাভাবিক বৃত্তি আশ মিটিয়ে খেলাবার সুবিধে পেয়ে, তাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণ ঘুচে গেলে, তখন কি USSR-এর নরনারীর মধ্যে বিদেহী প্রেমের চলাফেরার পথ

পরিষ্কার হবে ;—যে প্রেম গাঢ় হয়ে এলে নারায়ণকে সুদ্ধ টেনে আনবে ?

আমাদের বিবেচনায়, অবস্থা সব রকমে স্বাধীন রাখতে পারলে সে প্রেম লাভ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা,—তবে যদি ইতিমধ্যে বাইরের রাজশক্তির আক্রমণে অন্তরের শান্তি ভঙ্গ হয়ে বিপ্লবের তৈরি অনুকূল অবস্থাটাই ওলট-পালট হয়ে যায়,—সে কথা আলাদা।

ন হি কল্যাণকৃৎ দুর্গতিং গচ্ছতি

মোক্ষের বিষয়ে সাদা করে ভাবতে গেলে প্রথমেই কথা ওঠে—কোথা হতে কিসের মধ্যে মুক্তি।

যে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট আত্মা ভবের পালায় ফাঁকি দিয়ে সরে পড়তে ব্যস্ত, সে হয়তো শূন্যের মধ্যেও আরামের না হোক, বিরামের কামনা করতে পারে ; কিন্তু যে আনন্দ-মনে খেলছে, সে খেলার এক ধাপ থেকে পরের ধাপে এগোতে এগোতে খেলার শেষে— হারের নয়, জিতে যে শেষ, তাতে পৌঁছতে চায়।

খেলাটা তাহলে কী রকমের।

আনন্দলোকের আলো থেকে তো খেলুড়েরা নেমে এসেছে, ইহলোকের অন্ধকারে তো ডুব মেরেছে, আবার আলোর আনন্দে ফিরে যাওয়াটাই হল খেলার বাকি পালা। এক কথায় বলতে গেলে, আসার সময় ডুবুরির মতো এক ঝাঁপে তলানো, ফেরায় সময় নিয়ম বজায় রেখে, নানা ভয়-বিপত্তি কাটিয়ে, তবে ওঠা। অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে না উঠতে পারাটা ভয়ংকর হার, মনে করলে গা ছমছম করে ; মাঝের আবছায়ায় পথ ভুলে ঘুরে বেড়ানো, সে-দুর্ভোগও হারেরই সামিল ; সব বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে আনন্দে ফেরার শিহরণটাই জিত।

মানব-লীলার ভূমিকা (ইংরেজীতে যাকে বলা যায় play ground) সেটা কেমন।

রামধনুর মধ্যে ক'টি রং। এর উত্তর নানা রকমে দেওয়া যায়। চুল-চেরা বিচারক বলবে অসংখ্য—পাশাপাশি কোনো দুই রং ঠিক এক নয়; য়ুরোপের লোকে যে সময় উত্তর দেয়, তখনকার চলতি নামমতো সাত রং বলেছিল; মোটামুটি তিন রকমের রং-ও বলা যায়,—উপরের দিকে নীল জাতীয়, নিচের দিকে লাল-জাতীয়, মাঝে হারা-হারা। মানবাত্মার খেলাভূমি সম্বন্ধে তেমনি একভাবে দেখলে অসংখ্য লোক বলা যায়,—এই যে ইহলোক, এর মধ্যেই খেলুড়ে কখনো জড়ের টানে অন্ধকারে ঘুরে মরে, কখনো মেঘের একটি রং, গানের একটি সুর মনের একটি স্বভাব, তাকে কোন্ উঁচু চুড়োয় তুলে নিয়ে উপরের আলো দেখিয়ে দেয়। শাস্ত্রে বলে সপ্তলোক। মোটামুটি তিনটি নিয়ে আমাদের কথা চলতে পারবে,—উপরে তেজোময় অমৃতময় আনন্দলোক, নিচে অন্ধ তমসাবৃত মৃত্যুলোক, মাঝে আলো-ছায়া মেশানো রং-বেরঙে মনোহর বৈচিত্র্যলোক।

আর যে খেলুড়ে, তারি বা চেহারা কী রকমের।

সে তো ব্যক্তির উর্দি পরে খেলায় নেমেছে। সে আবরণের ভিতরেও তার সত্তার তিন স্তর—নিচে জড়তার, যার দরুন সে এক পত্তন তলিয়েছে; উপরে আনন্দের তেজ, যার টানে সে আবার স্বস্থানে ফিরতে পারে; মাঝে বুদ্ধিবৃত্তির খেলা, যা তাকে তোলপাড় করে ঘুরিয়ে বেড়ায়। ডুব দেবার সময় কিন্তু আদিস্থানের সঙ্গে তার যোগ ঠিক থাকা চাই, সেটা ছেড়ে গেলে আর ওঠার উপায় থাকে না, তলিয়ে হার হয়ে যায়।

একটা নকশার সাহায্যে আমাদের কথাটা আর একটু ফোটাবার চেষ্টা করা যাক।

ছেলেদের খেলার বেলুনের মতো খেলুড়েকে কল্পনা করা যাক। সে বেলুনের চামড়া ইলাস্টীক, যত গ্যাস পোরা যায় তত বাড়ে, বাড়লে হালকা হয়ে উপরে উঠতে চায়, গ্যাস কমে গেলে চুপসে মাটিতে পড়ে। বেলুনে শুধু গ্যাস থাকলে তো সে উড়েই যেত, তৈরির সময় কিছু বাজে আবর্জনা থেকে যায় বলে সে ধরায় থাকে। গ্যাসের আধারের সঙ্গে আমাদের এ বেলুনের নল দিয়ে যোগ রাখা আছে, গ্যাসের চাপ বাড়লে কানা যেখানে নলের সঙ্গে আঁটা আছে তার ফাঁক দিয়ে গ্যাস উথলে বেরোয়। বেশি আঁটা থাকলে তা হয় না, কিন্তু তাহলে নতুন গ্যাস পোরাও যায় না। খেলুড়ে এ রকম সজীব বেলুনের মতো এইটুকু মনে রাখলেই আমাদের নকশার কাজ হবে।

এক পক্ষে খেলুড়ে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি খেলিয়ে এমনভাবে বাড়তে পারে যে আনন্দলোকের সঙ্গে যে যোগধারা আছে তাতে শোষণের টান পড়ে। অপর পক্ষে আনন্দলোকে এমন ঢেউ উঠতে পারে—সৃষ্টির গোড়ায় একবার তরঙ্গ উঠেছিল, আর ওঠে না, এমন তো নয়—যার প্রেরণায় স্রোত খেলুড়ের ভিতর চলে আসতে পারে। যে উপায়েই হোক, খেলুড়ের ভিতরে আনন্দ বেড়ে গেলে সে বড়ো হয়, উপরে ওঠে। সেই সঙ্গে তার পাওয়া আনন্দধারার ভাগ আশেপাশে উথলে পড়ে।

এ অবস্থায় যে যে ঘটনাগুলি ঘটে, একটি একটি করে বুঝে দেখা যাক।

যে মানুষের উপরে ওঠার অবস্থা হয়েছে সে যদি বেলুনের মুখ কষে বাঁধার মতো নিজের অবস্থা করে, আশেপাশে খেলুড়ে থেকে

নিজেকে সরিয়ে রাখে, তাহলে তার উপরে ওঠার বাধা না হলেও পথের আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত থাকে। মনে পড়ে সেই ইংরেজকে যে পাহাড়ে-চড়ার গাড়িতে বসে, জানলার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে পথের সময়টা কাটিয়ে, উপরে পৌঁছে একেবারে হোটেলানন্দে বিলীন হল।

শুধু বঞ্চিত হওয়া নয়, এতে ভয়ও আছে। পরমার্থকে একা উপভোগের বাসনা স্বার্থের মতোই দিশাহারা করে দিতে পারে। এ অবস্থার একটি তিব্বতী বর্ণনা আছে। সংঘত্যাগী সাধক অভীষ্ট লোকের সন্ধানে বেরিয়েছে। পুবদিকে জলাশয়ের চিহ্ন দেখে স্নানের ইচ্ছায় সেদিকে চলল; পথে উত্তরদিকে ধোঁয়া দেখে গৃহস্থের আতিথ্যের লোভে সেদিকে ফিরল; মাঝের জঙ্গলে বিভীষিকা দেখে ভয়ে দক্ষিণে দৌড়ল; পথিকের কাছে পশ্চিমদেশের গুণবর্ণনা শুনে অবশেষে পশ্চিমেই যাত্রা করল,— এই রকম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তার ভ্রমণ। আমাদের ধারণা এই, আধা-আলোর জায়গায় এসে খেলুড়ে যদি মনে করে কেল্লা মেরে দিয়েছি, তাতে তার আবেগ মিটে গিয়ে তেজও টানতে পারে না, আর উপরে উঠতেও পারে না, পাঁচরঙা লোকে ঘুরে বেড়াতেই থাকে,—যে অবস্থাকে হারের সামিল বলা হয়েছিল।

আনন্দটানার ক্ষমতা থাকায় যে উঠতে পারে, সে যদি আনন্দ বিলবার কারণে কনিষ্ঠ সাথীদের স্তরে থেকে যায়, তাহলে মাঝপথে আনন্দ আদান প্রদানের একটা উপরি খেলা চলে। এ রকম খেলুড়ের ভাব বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মতো, যিনি বলেছিলেন—"যতক্ষণ না সবাইকে সঙ্গে নিতে পারব, ততক্ষণ মোক্ষ পাবার অধিকারী হলেও আমি তা নেব না।"

ঘটনাক্রমে এ রকম জ্যেষ্ঠ যাত্রীর উদ্‌বৃত্ত আনন্দের সঙ্গে কনিষ্ঠের

আনন্দধারার যদি যোগ হয়ে পড়ে, তাহলে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ দাঁড়ায়। শিক্ষার আসনে অনেকে বসেন, তাঁদের শিষ্যও জুটে থাকে, কিন্তু আনন্দ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ না হলে গুরুকে সদ্‌গুরু বা শিষ্যকে সৎশিষ্য বলা যায় না।

সৎশিষ্যের আগ্রহ আনন্দধারায় দেয় টান, তার আনন্দের খোরাক যোগাতে হয় গুরুকে। ব্যায়ামের গুণে খিধে বাড়ার মতো, শিষ্যকে আনন্দ যোগাবার এই প্রয়োজনই গুরুর উপর-থেকে আনন্দশোষণের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। আনন্দ দানই আনন্দ পাবার উপায়, আনন্দ পাওয়া আরো আনন্দ দানের উপায়, গুরুর লাভ হয়, এই চক্রবৃদ্ধি আনন্দধারা।

শিষ্যের দিক থেকে দেখলে, তার নিজের ক্ষমতায় যেটুকু সম্ভব হত, গুরুর কাছ থেকে তার চেয়ে প্রবল স্রোতে আনন্দ পাওয়ায়, শিষ্য বেড়ে ওঠে। শেষে ঐ চক্রবৃদ্ধিস্রোতে পুষ্ট হতে হতে শিষ্য গুরুর সমান পদবী পেয়ে যায়, তখন গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ঘুচে গিয়ে আসে নিছক মিত্রতা, যার মধ্যে প্রেমের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাব পাওয়া যায়।

গুরু যতক্ষণ উপর-থেকে তেজ টেনে শিষ্যকে যোগাচ্ছেন ততক্ষণ আনন্দলোকের যিনি অধিপতি, আর তাঁরই আনন্দ বিতরণের উপলক্ষ্য যে গুরু, আনন্দদাতা আর আনন্দবাহক, এ দুজনের মধ্যে ভেদজ্ঞান শিষ্যের উপস্থিতমতো লোপ পেতে চায়। আসলেও কোনো ভেদ থাকত না যদি সোজাসুজি পাওয়ার, আর গুরুর রঙে রঙিয়ে পাওয়ার প্রভেদটা না থেকে যেত। কলকাতার নলের জলে আর গঙ্গার জলে যেমন তফাত থাকত না, যদি মাঝে ফলতা জল-কলের পাঁচরকম কেরামতি না এসে পড়ত।

সমান পাত্রের মধ্যে আনন্দধারার যোগ-স্থাপন হলে দুজনের আনন্দ

চালাচালি নানা রকমে হতে পারে,—একজনের বেশি দেওয়া, একজনের বেশি পাওয়া, চাকার মতো দেওয়া নেওয়ার ঘোরাফেরা ; কিন্তু যতই রকমারি হোক, দুজনের মধ্যে প্রেমের আদানপ্রদান শুরু হলে, মূল উৎস থেকে দুজনেরই তেজ-টানা বেড়ে যায়, দুজনেরই আনন্দ বেশি বেশি উদ্‌বৃত্ত হয়, ফলে দুজনেই প্রেমের আলোয় দুনিয়া সুন্দর দেখে প্রেমের ভাগ জগৎকে বিলোয়। এর বিপরীত অবস্থা হলে সন্দেহ হয়, সত্যিকার প্রেম হয়েছে, না কোনো প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি বা মোহের ঝোঁকে দুজনে কাছাকাছি এসেছে মাত্র।

প্রেম বিদেহী হলেও, দেহের নামরূপটা বাদ রাখা চলে না। শিষ্য বেচারী সদানন্দের খোঁজে বেরিয়ে চিদানন্দের কাছে গিয়ে পড়লে, তাঁর সঙ্গে তার বাঞ্ছিত সম্বন্ধ নাও ঘটতে পারে। তাছাড়া কণ্ঠস্বরের, মুখ-চোখের ভাবের, সাহায্য ছাড়া গুরুর মর্ম সব সময়ে হৃদয়ংগম নাও হতে পারে। আসল কথা, বোঝার সুবিধের জন্যে, স্থূল দেহ, সূক্ষ্মশরীর, প্রাণমন চিত্তবুদ্ধি, আত্মার এ সব ভাবকে আলাদা করে দেখি বটে, কিন্তু সবই তো একের ভিন্ন স্তরে প্রকাশ, কোথায় একটার শেষ অন্যটার আরম্ভ ধরাই যায় না। স্থূল দেহের মধ্যে মাদক ঢোকাও, সূক্ষ্ম বুদ্ধি-বৃত্তি যাবে গুলিয়ে। ওদিকে আত্মার উন্নত অবস্থা শরীরের জেল্লায় প্রকাশ পায়। তবু বলতে হয়, প্রেমের খেলা আধ্যাত্মিক স্তরেই চলে।

নরনারী ভেদে বিদেহী প্রেমের কিছু রসভেদ হয় কি না, সেকথা মাঝে মাঝে ওঠে। নরনারীর দেহযন্ত্র নিয়ে অবশ্য একথা উঠতেই পারে না, তবে সূক্ষ্মস্তরেও নরনারী ভেদ স্বীকার করতে হয়। বীরাঙ্গনাকে বলা যায়, সে দেহে নারী, মনে পুরুষ। মহাপ্রভুর রাধাভাবে আরাধনা মানে তাঁর আধ্যাত্মিক নারীরূপ নেওয়া। খ্রীস্টান সাধকেও বলেন, যিশুকে জীবনের নিয়ন্তারূপে পেতে হলে আত্মাকে নারীপদবীতে তুলে

তবে সমর্পণ করতে হয়। আমরা এইটুকু বুঝি, প্রেমিকের দেহের অবস্থা যাই হোক, যার আনন্দস্রোত বহির্মুখী তার পুরুষভাব, যে অন্তরে গ্রহণ করে তার নারীপ্রকৃতি। এই দেওয়া-নেওয়ার পৃথক রসকে কি নিগমানন্দ আর আগমানন্দ বললে দোষ হয়। যাই হোক, আলাদা নাম চলতি না থাকলেও রসভেদটা অনুভবে ধরা পড়ে।

একটি অবস্থার কথা বাকি। দৈবাৎ কখনো অনেকে মিলে পরস্পরের সঙ্গে আনন্দধারার যোগে বেঁধে পড়ে একটা প্রেমচক্র তৈরি হয়। একেই আদর্শ সংঘ বলা যায়। প্রত্যেকের বহির্মুখী ধারা অপরের অন্তরে প্রবেশ করায় এ রকম চক্রের অসীম শক্তি জন্মায়, যার সমবেত টানটা উর্ধ্বমুখী। ফলে, চক্রের প্রত্যেকে পথের আনন্দও যেমন পুরো আদায় করে, তাদের উপরে ওঠাও তেমনি জোরে এগোয়। এ রকম ঘটনা মনে করে দয়াল দাদু বলে থাকবেন—"জলের ফোঁটা একা চললে পথে শুখিয়ে যেতে পারে, অন্যের সঙ্গে মিলে ধারা বাঁধতে পারলে নদী হয়ে সমুদ্রে পৌঁছে যায়।" সব সাচ্চার মেকী থাকে, সংঘ বা চক্রেরও তাই। যার গরজ সে অনায়াসে প্রেমের লক্ষণ দেখে আসল চিনে নিতে পারবে।

প্রেমের লক্ষণ দিয়ে যাচাই করলে অনেক হেঁয়ালির উত্তর পাওয়া যায়, অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়। দু একটা নমুনা দেখা যাক।

এ ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক যে শিষ্য তো অজ্ঞান অবস্থায় গুরু খোঁজে, তখন সদ্‌গুরু চিনবে কী করে। প্রেমানন্দই পথ দেখায়। সেটা পেলে কে না বোঝে। তবে ভুল হওয়ারও কারণ আছে। গুরুবাদ সম্বন্ধে লৌকিক অলৌকিক এত রকম গল্পগুজব চলতি আছে, যারা কান-পাতলা তাদের অবস্থা সেই বুড়ির মতো হতে পারে, যে ছেলের আলিফ-বে-তে ফারসী বর্ণমালা আওড়ানো শুনে ঠাকুরদেবতার নাম হচ্ছে মনে

করে নয়নজলে বয়ান ভাসাল অবশ্য মোহের নকল আনন্দ টেঁকসই হয় না, তাই শিষ্যের মেজাজ ক্রমশ রুক্ষ হচ্ছে বা নির্বিচারে মানুষকে মানুষ বলে ভালোবাসতে পারছে না, দেখলে, বোঝা যায় গুরুকরণে গলতি হয়েছে, পরশমণির ছোঁয়া পায়নি।

আমাদের ধারণা অনুসারে গুরুর দেওয়া মন্ত্র ক দিয়ে আরম্ভ কি হ দিয়ে আরম্ভ, তাতে কিছু আসে যায় না, কোনো মন্ত্র না দিলেও লোকসান নেই ; নিজে প্রেম টানতে পারলেই সদ্‌গুরু শিষ্যকে বাঞ্ছিত ধন দিতে পারবেন।

সাধনা তো রকম বেরকমের হয়ে থাকে কিন্তু আনন্দ পাওয়া দেওয়ার যে প্রেমের অবস্থাকে সিদ্ধি বলা যায়, সে কি আর এক বৈ দুই হতে পারে। গীতার কথা ধরলে সে-সিদ্ধি যেন সাধনার উপর নির্ভরই করে না। যার যেমন ভাবনা তার সে পর্যন্ত সিদ্ধির দৌড়, আমরা তো এভাবে গীতার উপদেশ বুঝেছি। ভাবনা বলতে মাথা বকানোও নয়, কল্পনা খেলানোও নয় ; এখানে "ভাবনা" মানে "হওয়া।" যে যত প্রেমিক হতে পেরেছে তার সিদ্ধি-লাভ ততটাই। বিনা প্রেমে গুরুর পক্ষে নন্দলালকে পাইয়ে দেবার চেষ্টা বৃথা। অপর পক্ষে প্রেম থাকলে সৎ-শিষ্য গুরুকে উপলক্ষ করে নিজের আবেগের জোরে নিজের কাজ হাসিল করতে পারে।

শ্রদ্ধায় যে প্রশ্ন তার মনে জন্মায়, উত্তর তার মধ্যেই নিহিত থাকে, গুরু-দর্শনের আনন্দে আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এক রসিক বলেছিল —শিষ্য গুরুকে বলে "মন-তোর-দে," গুরু শিষ্যকে বলেন "মন-তোর-নে।" শিষ্য নিজেরই সাধনের ধন গুরুপ্রেমের আলোয় দেখতে পায়।

আর এক সমস্যা হচ্ছে, সব সদুপদেশই বলে লোকের হিতে রত থাকতে। মুশকিল এই তো নিজেরই হিতাহিত বুঝে ওঠা দায়, পরের হিত

তো দূরের কথা। তাড়াতাড়ি হিত করতে গেলে রোগীর যে-দাঁতে ব্যথা নেই সেটা তুলে দেবার মতো বিপরীত না হয়। এখানেও পথ দেখায় প্রেম। যাকে আনন্দ দিতে পারা গেল, তার হিত করা হল সে বিষয়ে কি সন্দেহ থাকতে পারে। এই প্রথম ধাপে পা দিলে দ্বিতীয় ধাপ তখন আপনিই দেখা দেবে। আনন্দ দিলেই তো আনন্দ পাওয়া যায়। তার মানে কল্যাণ করতে গিয়ে কল্যাণ লাভ হয়। উধ্বর্গতিই কল্যাণের লক্ষণ, তাই এ বর্গের মাথায় গীতার কথা তুলে দেওয়া হয়েছে —কল্যাণকারীর দুর্গতি হতে পারে না।

খেলায় জিতের চেহারাটা কী, এখন কতক বেরিয়ে পড়েছে। পরস্পরের সঙ্গে প্রেমের যোগের আনন্দে ভরপুর হয়ে, বড়ো হতে হতে যখন ব্যক্তিত্বের আবরণ স্বচ্ছ সূক্ষ্ম হয়ে যাবে, তার ভিতরকার আবর্জনার জড়তা খসে যাবে, তখন আনন্দলোকে উঠে যাবার আর বাধা থাকবে না, সেখানকার আলো ভিতরে বাইরে সমান প্রকাশ পাবে; তখনকার আবরণ সে বিঘ্ন নয়,—"আমার এই স্বস্থান, এতে ফিরে এসে আনন্দের প্রেম-রূপ লাভ করলাম"— এই চৈতন্য সজাগ রাখার জন্যে যেটুকু ব্যবধান নইলে নয়, তাই খেলার শেষ পর্যন্ত থাকবে।

USSR-এর মোক্ষলাভ সম্বন্ধে অবস্থা আমাদের বিচারের বিষয় ছিল। তাঁদের নিজেদের মধ্যে সদ্ভাবের পরিচয় তো পাওয়া গেছে; সংঘের ঠাটটাও তাঁরা বেশ গড়ে তুলেছেন। তার মধ্যে বিদেহী প্রেমের সুর উঠেছে কিনা, সে খবর কে দিতে পারে।

যে সব পাশ্চাত্য পর্যটকেরা রুশে যাতায়াত ক'রে ঝুড়িঝুড়ি মন্তব্য ছড়িয়ে বেড়ায়, তারা তো সব ধনলোভী, প্রেমের লক্ষণ তারা কী জানে। তারাই তো প্রণয়কে নিজের যথাস্থান থেকে তুলে দিয়ে, নভেলে নাটকে সিনেমায় তাকে মানবজীবনের একমাত্র সম্বল বলে ঢাক-পেটানোর

চোটে পৃথিবীময় নরনারীর সহজ সুন্দর সম্বন্ধটা মাটি করবার যোগাড় করে এনেছে। বিদেহী প্রেমের খেলা দেখলেও তাদের পক্ষে চেনা সম্ভব হয় না ; মনের মধ্যে আভাস পেলেও প্রকাশের ভাষা জোটে না।

এক যদি এ দেশ থেকে প্রেমধন নিয়ে কোনো সাধক রুশে যান, USSR-এর সমবায়ীদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতান, তিনি তাঁদের মুক্তির রাস্তায় প্রগতির কথা বলতে পারবেন। সেখানে সমাজের যে ভূমিকা গড়ে উঠেছে, তাতে না করে সহকর্মী নারীকে "কামিনী" জ্ঞান, না করে কাঞ্চনে নিজের জন্যে লোভ,—এমন স্থান সাধকপছন্দ তীর্থ না হবে কেন।

আমাদের কথা তো ফুরল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপদও ঘনিয়ে এল। যুগল-মিলন না ঘটিয়ে কথা শেষ করলে নেহাতই বেদস্তুর হবে, কথককে শ্রোতারা দুয়ো দেবে। অথচ যতবার ধুয়োয় এসে খোঁজ নেওয়া গেছে,—নারায়ণ বলেন লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা না হলে তিনি ধরা দেবেন না ; লক্ষ্মী বলেন যেখানে নারায়ণের দর্শন নেই সেখানে তিনি স্থির হয়ে থাকতে পারেন না।

এখন উপায় ?

কবিরা বিপদ গনলে বাণীকে ডাক দেন ; আমরাও তবে ভারতীর শরণাপন্ন হই ; তিনি আমাদের ভোঁতা বুদ্ধিবৃত্তিতে ধার দিয়ে, যে সব গাঁঠ পড়ে আমাদের সত্তা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, সেগুলো কেটে ফেলে আস্ত মানুষ হয়ে ওঠবার উপায় করে দিন। তিনি ছাড়া আর কে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে, নরনারী লক্ষ্মীনারায়ণ সবই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পালান্ত পরিচ্ছেদ

কী হবে

যে সব পাশ্চাত্য পর্যটক আজকাল রুশের অবস্থা দেখতে যান, তাঁরা USSR এর অধীনে শ্রমিকবর্গের সুখস্বচ্ছন্দে থাকার চেহারা অস্বীকার করতে পারেন না ; অথচ তাঁরা যাকে সভ্যতা বলেন তার বিধিনিষেধ রীতিনীতি সব উলটপালট করেও যে, মানুষের ভালো চলতে পারে, সে কথা তাদের মন একদম নিতে চায় না ; তাই ভীমরুলের যেমন লেজে হুল, তাঁদের মন্তব্যের শেষে একটা খোঁচা থেকে যায়—“এ ভালো কি টিঁকবে।”

নগরকীর্তনে মেতে উঠে নাগরিকেরা কোলাকুলি করে, পরে উচ্ছ্বাস জুড়িয়ে গেলে, যে-দলাদলি সেই দলাদলি এ স্থলেও, সেই পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলেন, বিপ্লবের ঝাঁজ নরম পড়লে, আবার হবে ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই। সেটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়, আশপাশের হিতৈষী (!)-রা পথ চেয়ে বসে আছেন, সে কথা অবশ্য থাকে উহ্য।

আমরা এ পথেরও কিছু জানি, ওপথেরও কিছু জানি ; তাছাড়া মরে আছি বলে মরণদশারও লক্ষণ জানি। সে অবস্থায় USSR-এর ভবিষ্যতের বিষয়ে অন্তত আমাদের ধারণাটুকু না বললে শ্রোতারা গোলমাল করতে পারে, ভাববে, কথক ফাঁকি দিয়ে উঠে পড়ল। তাই এই উপসংহার।

যিশুখ্রীস্ট বলেছেন, তলোয়ার যার জীবিকা, তলোয়ারেই তার বিনাশ। USSR সম্বন্ধে এ কথা খাটে কি না সন্দেহ, কারণ রিপুর বশে তাঁরা তো অস্ত্র ধরেননি। দেশের প্রজাবৃন্দের উপর অনেক দিনের

অমানুষিক অত্যেচার এড়াবার ভাবনা করতে করতে শ্রমিকদের সমবেত সমিতির যে পরিকল্পনা উদয় হয়েছিল, সেটাই হল আসল জিনিস—তাকে বাস্তব রূপ দিতে শেষে অস্ত্রের সাহায্য লেগেছিল বটে, তা সত্ত্বেও জীবিকার উপায় করা হল তলোয়ার গলানো লাঙল-ফলায়, তাও চালাবার ভার সমবায়তন্ত্রের, যার ধর্মই হল মিলেমিশে কাজ করা। কাজেই, USSR এমন কোনো রক্তবীজ বুনেছেন যার ঝাড় তাঁদেরই কাল হবে, সে কথা বলা যায় না।

ঘরে বাইরের শত্রুর সঙ্গে অহিংসারীতি অনুসারে যুদ্ধব্যাপার না চলায়, আমাদের মহাত্মার মতে হিংসার জড় ভিতরে থেকে গিয়ে শেষে মারমূর্তিতে দেখা দেবার আশংকা আছে। কিন্তু এ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত USSR-এর হিংস্র ভাব কিছু তো প্রকাশ পায়নি। ইরান দেশকে রুশসম্রাট প্রায় গিলে ফেলেছিল, USSR তাকে ভালো মনে, প্রতিদানের দাবি না করে, মুক্তি দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের পথে এগিয়ে দিলেন। সম্রাট আমলের খ্রীস্টানধর্ম প্রবল থাকতে ইহুদীদের উপর যে অকথ্য নিষ্ঠুরতা করা হত, ধর্ম-বুলি-বিহীন USSR তাঁদের প্রতি কী রকম মমতা দেখিয়ে সেটা মুছে ফেলার চেষ্টা করলেন। শুধু তাই বা কেন। USSR-এর অন্তর্গত কত আলাদা জাত, আলাদা সম্প্রদায় নির্বিবাদে এক সঙ্গে আছে, নিজের নিজের আচারব্যবহার রুচিকৃষ্টি অনুসারে জীবন চালাবার বাধা পায় বলে শোনা যায় না।

এখনকার যুদ্ধের ভাবটা যে ঠিক কী, সেটা যুদ্ধ শেষ হবার অনেক দিন পর ছাড়া জানতেই পারা যাবে না। হালের বাজে খবরের উপর নির্ভর করে আন্দাজী মন্তব্য প্রকাশ করতে যাওয়ায় কোনো লাভ নেই।

অহিংসার সব অন্ধিসন্ধি ঠিকমতো বুঝে-ওঠাই দায়। অন্যায়ের

প্রতীকার নানা রকমে চেষ্টা করা যায়,—গায়ের জোরে, বাক্যের জোরে, ব্যবহারের জোরে—অনেক সময় সোজাসুজি মারের চেয়ে বাক্যযন্ত্রণার পীড়া বেশি, আরো কষ্ট দেওয়া হয় সম্পর্ক ছেঁটে ফেললে। তাই একা মারাকে হিংসা বলে ধরা চলে না। আবার ছোটো মার দিয়ে বড়ো মার থেকে রক্ষে করতে পারলে হিংসার হিসেবে সেটা উলটো দিকে চলে আসে। তা ছাড়া, মারাটা যেন হিংসা হল, বিনা প্রতীকারে অসহায়কে মার খেতে দেওয়া, সেটা কি অহিংসা। প্রাণ রাখতে সদাই প্রাণান্ত—এ সমস্যার জবাবদিহি প্রকৃতির।

প্রকৃতির হাত ছাড়িয়ে উঠে, মানুষের কোনো দল কোনো দেশে নিজেকে উঁচু পদে তুলতে চেষ্টা করছে, সেটা সারা দুনিয়ার পক্ষে সুখবর। হিংসার ওষুধ যে প্রেম, এ আবিষ্কার ভারতের; কিন্তু ভারতীয় সমাজকে জাতিভেদ মেনে ব্যক্তিগত স্বার্থের অধীনে চলতে দেওয়ায় সে উপলব্ধি সংসারের কাজে আগেও লাগেনি, আজও লাগতে চাচ্ছে না, রয়ে গেল বচনেই, সে কথা পালার মধ্যেই বলা হয়েছে। সে উপলব্ধির উপযুক্ত নির্লোভ কর্মক্ষেত্র USSR গড়ে তুলছেন বলেই তাদের সঙ্গে লেগেছে লোভপন্থী রাক্ষসের দল। তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বামিত্রের মতো ক্ষত্রিয় তেজকে লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী।

ক্ষত্রপদ্ধতি হচ্ছে— "হয় ক্ষান্ত দাও, নয় অন্ত হও।" অত্যাচার সহ্য না করে অক্রোধে প্রাণ দেওয়ার উপদেশ অহিংসাপন্থীদের অনুমোদিত। তেমনি কি ধর্মরক্ষার্থে অক্রোধে প্রাণনাশও চর্চা করা যায় না, অসহায়ের গায়ে যে ছুরি তুলেছে উভয়ের প্রতি দয়া করে তার হাতে লাঠি মেরে নিরস্ত্র করার মতো?

এ সব শক্ত সমস্যা মীমাংসা করে USSR-এর ঐহিকপারত্রিক পরিণাম সম্বন্ধে রায় দেওয়া আমাদের সামর্থ্যে কুলোবে না। এখন

মরণদশার কোনো লক্ষণ দেখা যায় কিনা, সেটা অনুসন্ধানের বিষয়। সে লক্ষণগুলি কী রকম।

কুলক্ষণ

সমবায়ীরা নেতাদের সদুপদেশকে জীবনযাত্রার পাথেয় না করে, যদি তাদের মূর্তি বা ছবি ফুল, বাতি, ধূপধুনো দিয়ে পুজো করতে শুরু করে, তাঁদের মধ্যে কে বড়ো তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগায়—

পরস্পরের প্রতি আন্তরিক দরদ, পরস্পরের উন্নতির জন্যে সত্যিকার আগ্রহ—এই দিয়ে সমবায় খাড়া না রেখে, অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে পদ্ধতির বদল না করে, যদি কোনো একজনের বা এক সময়ের তৈরি নিয়মকানুনকে যায়-প্রাণ থাকে-প্রাণ অটুট রাখাই সার ধর্ম বলে মানতে আরম্ভ করে, জপে-মোচড়ানো মনের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার পথ রুখে দেয়—

"যা করেছি খুব করেছি আর দরকার নেই" এই বলে যদি সন্তোষ শান্তি এই রিপু-ভাইদুটির পাল্লায় পড়ে উপর থেকে প্রেরণা আসার রাস্তা খোলসা না রাখে; কিংবা "আমরা যা দেখিয়েছি, পৃথিবীর আর কেউ তা পারেনি, পারবে না" এই দম্ভের মোহ আলসে মেরে গিয়ে নতুন বিদ্যে লাভের, নতুন উদ্ভাবনের চেষ্টায় খতম দিয়ে বসে থাকে—

এ রকম কুলক্ষণের কোনো একটি প্রকাশ পেলে USSR-এর বাড় ফুরিয়েছে, সে নাবী-মুখে এসে পড়েছে, বুঝতে হবে। প্রকৃতির ঠেলা-ঠেলির মধ্যে উপরে উঠতে না থাকলে নিচে পড়ে যেতে হয়, নিশ্চিন্ত হয়ে মাঝামাঝি বিরাম লাভের উপায় নেই।

তবে USSR-এর যদি পতন আরম্ভ হয়েই থাকে, সেটা বোঝার জন্যে মহা অনুসন্ধানে মাতার কোনে দরকার নেই,— তাতে আমাদের লাভটা কী। আমরা তো আহ্লাদ করে USSR-এর অভ্যুদয়ের কথা বলতে বসেছিলাম, শুনতে তোমাদিকে ডেকেছিলাম,— তাঁদের ভালো দেখে কিছু শিখব বলে, তা নেহাত না পারলেও তাঁদের সুগতি দেখে আনন্দ করব বলে। মরণদশা দেখার জন্যে সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হওয়া লাগবে কেন, দুয়োরের গোড়ায় হিন্দুজাতের গঙ্গাযাত্রা তো রোজই চলেছে।

ভয় নেই

তবে শোনো, নাতিনাতনীরা, যারা এতদুর পর্যন্ত ধৈর্য ধরে এ বইটা পড়েছ—এখন পালার কথা শেষ হয়েছে, এইবার দাদাগিরি ফলিয়ে তোমাদের উপর কিছু উপদেশ ঝেড়ে বিদায় করতে চাই। তোমরা যদি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস কর—"আচ্ছা বুড়োর পাল্লায় পড়েছি, দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতো থামতে পারে না।" তাহলে মনে করিয়ে দেব তোমাদেরও ছোটোবেলার প্রশ্নের স্রোত অফুরন্ত ছিল, তার ঠেলা তো বুড়োকেই সামলাতে হয়েছে; তাই এখন শোনবার ডাক পড়লে ফোঁস করা চলবে না। তাছাড়া শেষে একটু মুরুব্বিয়ানার ঢং না করলে মা-বাপে তোমাদিকে আমার কাছে আর আসতেই দেবেন না। হাজার হোক, তাঁরা সেকেলে লোক, মনে করেন ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে বকুনি না খেলে বকে যাবার ভয় থাকে।

তাই যা বলি, শুনে যাও।

আমাদের দেশের, আমাদের জাতের গতিক বড়ো ভালো নয়, পালা

ভনতে ভনতে এ ভাবের কথা মাঝে মাঝে বলতে হয়েছে ; সত্যি কথায় কখনো ইষ্ট বৈ অনিষ্ট হয় না তাই বলেছি ; তাতে তোমাদের মন খারাপ হবার কিছু নেই। দেশের, জাতের, সমাজের উত্থান পতন লেগেই আছে, পতনের সময় বিষণ্ণ হলে আবার উত্থানের দেরি হওয়া ছাড়া, লাভ কিছু নেই। সে কথা তোমরা প্রত্যেকে মনে রেখো। প্রত্যেক "তুমি" যা করবে তাই জড়িয়ে "তোমাদের" করা হবে।

তোমার অভিধান থেকে 'অসাধ্য' আর 'নৈরাশ্য' এই দুটো কথা কেটে দিয়ো। সমস্যা আসে মেটাবার জন্যে ; সংকট আসে পার হবার জন্যে ; দুঃখ আসে শক্তি জাগাবার জন্যে। রাত যত ঘনিয়ে আসে উষা তত এগিয়ে আসে, সে কথা ভুলো না।

অন্তর্যামী ভৎর্সনাকে যদি ভয় করে চল, তাহলে জগতে আর কিছুর ভয় থাকবে না,—মৃত্যুরও না ; বিশেষত যদি 'আমার' জায়গায় সর্বদা 'আমাদের' ভাবনা করা অভ্যেস কর। আমি মরলে আমরা সকলে তো মরব না। তোমার জীবনমৃত্যু যদি এমন হয় যে, তাতে তোমাদের সকলের আরো ভালোভাবে বাঁচার সুযোগ হবে, তাহলে সেই সকলের মধ্যে তুমি অমর হয়ে থাকবে।

পূর্বজন্মের কর্মফল নিয়ে বৃথা মাথা বকিয়ো না। সে বিষয়ে ঠিক জানারও উপায় নেই, তা নিয়ে তোমার করারও কিছু নেই। প্রতি মুহূর্তেই তোমার নবজন্ম, সে মুহূর্তে তুমি স্বর্গে থাকবে কি নরকে থাকবে, সেটা তোমার হাতে। পরকাল নিয়েই বা ভাবনা কেন। ইহকালটা ফুরলে তবে না পরকাল। যে কালে আছ, সেই বর্তমান কালটা ভালো করে কাটাতে পারলে, ভাবীকাল আপনিই সামলে যাবে।

ভালো করে কাল কাটানো কাকে বলে। পদে পদে "তোমার" এবং

"তোমাদের" আনন্দ বাড়াবার ব্যবস্থা করা,— অন্য লোকে কবে কী করেছে তাই পড়েশুনে নকল করে বাসী ভাবে নয়; নিজের বুদ্ধিবৃত্তি টাটকা খাটিয়ে—বুদ্ধি দিয়ে ভেবে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, কাজে আগ্রহ করে। নিজের সত্তার এমন টলটলে অবস্থা করে তোলো যে যেমন মনে বোঝা, অমনি বুকে দরদ, তৎক্ষণাৎ চেষ্টায় হাত।

টাটকা কাজ করাই সৃষ্টি করা। শরীরমন যদি পরিষ্কার রাখ, চিত্ত যদি শুদ্ধ রাখ, তাহলে সেগুলি তোমার নিজের তৈরি জিনিস হয়ে উঠবে। আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক যা আছে তা আছে, নিজের স্বভাব দিয়ে যেটিকে আরো মিষ্টি করে তুলতে পারবে সেটি তোমার হাতেগড়া সম্বন্ধ হবে। যেখানে সম্পর্ক থাকার কোনো লৌকিক কারণ নেই, সেখানে সুখদুঃখের ভাগী হয়ে সম্বন্ধ পাতিয়ে বসা যায়। কাজে ব্যবহারে কথায় কথায় নিত্যি নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়। নিজের মনহৃদয়ের রস দিয়ে জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াকে উৎসব, প্রত্যেক উৎসবকে আনন্দময় করে তোলা যায়। একবার সৃষ্টি করব ব'লে বসলে দেখবে এমন ঘটনা নেই যাকে নিজের ছোঁয়া দিয়ে আপনার না করে নেওয়া যায়। এই সৃষ্টি কাজেই মানুষ মানুষের উপযুক্ত আনন্দ পেতে পারে। এ সৃষ্টি রোজই করা যায়, এবেলা ওবেলা করা যায়, উঠতে বসতে করা যায়; এর জন্যে আলাদা সময় তুলে রাখার আবশ্যক করে না,—প্রতি মুহূর্তেই করা যায়। যে মুহূর্তকে আনন্দময় করে তুলতে পারবে, তাতেই অনন্তের অ স্বাদ পাবে।

জিজ্ঞেস করতে পার, যে প্রেমের প্রেরণা সৃষ্টি করায় সে প্রেম পাওয়া যাবে কেমন করে। যিশু বলেছেন ঘা দিলে দরজা খুলে যায়। পতঞ্জলী বলেছেন যত আবেগে চাবে তত বেগে পাবে। তার সোজা মানে, চাওয়া আর পাওয়া একই কথা। প্রেমের আলো সকলের মধ্যে

কিছু না কিছু আছে,— পথ দেখাবার ভারটা সেই আলোর উপর দিলেই মিটে যায়। যেটুকু আলো আছে প্রথম পা বাড়াবার পক্ষে তাই যথেষ্ট ; কোনো দলকে যদি বিরোধী মনে কর, তার একজনকে ভালোবাসতে পারলে দলের সঙ্গে বিরোধ ভঞ্জন হবেও এক পা এগোলে পরের পা ফেলার জায়গা তখন দেখা দেবে। মিলেমিশে চললে আলো বাড়ে, তাতে চলা যায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু যে রকম করেই চলা হোক, চলার চেয়ে এগোবার সহজ কৌশল কেউ বাতলাতে এলে, তাকে সন্দেহের চোখে দেখো।

যতদিনে তোমরা তোমাদের নাতিনাতনীদের সঙ্গে খোসগল্প করতে বসবে, তার মধ্যে আমাদের দেশে আশার উষা দেখা দেবার সময় এসে যাবে। অরুণোদয়ের লালে-লাল শোভা সামনে দেখলে তারি কথা নিশ্চয়ই তোমরা বলাবলি করবে। তখন আলোচনার বিষয় হাজার হাজার মাইল দূর থেকে টেনেবুনে আনতে হবে না।

সেই ভরসায় উৎফুল্ল হয়ে বুড়ো মানুষের কাঁপা-গলায় আমি জিজ্ঞেস করি,—"আমরা কি দমে আছি।"

তোমরা সিংহনাদে গর্জাও— না ! না !! না !!!

টিপ্পনী

ঋণস্বীকার

পালা সাজাবার জন্মে পাঁচ জায়গা থেকে নানা রসের কথা কুড়িয়ে এনে ধরে দেওয়া গেছে। যেখানে সবই পরের কাছে পাওয়া—সেখানে বিশেষ করে কার ঋণ স্বীকার করা যায়। যে শ্রোতার যা ভালো লেগে যায়, সে যাতে ইচ্ছেমতো মূলে গিয়ে তৃপ্তি পেতে পারে, তার উপায় রাখলেই হল।

USSR-এর সমীকরণ যন্ত্রকে উপলক্ষ্য করে, ভবলীলার আকার প্রকার বোঝা ছিল আমাদের আসল উদ্দেশ্য, যাতে সমজদার হয়ে পরের ভালো খেলা তারিফ করতে পারি, খেলায় পটু হয়ে নিজেরাও আনন্দ দিতে নিতে অপারক না হই।

খেলার দুটো দিক আছে। এক হল নিয়মকানুন,— যা মেনে অন্তত বাঁচিয়ে না চললে খেলা দাঁড়ায় হুটোপাটিতে, আমোদ লাগার চেয়ে চোট লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশি। আর হল ভাব, যার লক্ষণ হচ্ছে পরস্পরের সুবিধে-অসুবিধে বুঝে চলা, নিজের ভালো চালে পরের ভালো চালে সমান খুশি হওয়া, মনে রাখা যে, সকলে মিললে তবেই হয় খেলা, নিজে বাহাদুরি নেবার মোহে না পড়া,— যে ভাবকে ইংরেজিতে বলে স্পোর্টস্‌ম্যান্‌লাইক (sportsmanlike)।

ভবলীলারও সে রকম দুইদিক আছে। একপক্ষে খেলুড়েকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হয়; তবে জীবের মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা পেয়েছে বলে সে নিয়মকে কতক এড়িয়ে কতক বদলে চলতে পারে। আর খেলুড়েকে ভাবও ঠিক রাখতে হয়, সাথীদের সঙ্গেও বটে,

খেলানেওয়ালাদের সঙ্গে তো বটেই, নইলে তাঁর সঙ্গে যোগ ছুটে গিয়ে, তলিয়ে বা পথ ভুলে, খেলাটা হারে না শেষ হয়।

প্রথম দিক থেকে বিচার করার সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা নিয়ে আমরা আখর দিয়েছিলাম। পাশ্চাত্য ভাষায় বিজ্ঞানের বা ভ্রমণের বইয়ের অভাব নেই, সেগুলি দরকারমতো পড়তে পাওয়াও শক্ত নয়; তাই বিশেষ স্থল ছাড়া আলাদা করে কোনো বইলেখকের নাম করা হয়নি।

ভাবের কথা আশ মিটিয়ে পেতে হলে যেতে হয় বেদ-উপনিষদে, যার মধ্যে আমাদের চিরনমস্য ঋষিদের বাণী ধরা আছে। সেখান থেকেও আমরা দরকারমতো চুনে নিতে ছাড়িনি, কিন্তু ফী হাতে গ্রন্থের নাম শ্লোকের নম্বর দিলে বিশেষ সুবিধে হত না। এক তো, ঋষিদের বচন পড়া আজকালকার ফেশান নয়, তা ছাড়া বই আনিয়ে খুঁজে পেতে বার করলেও দেখা যাবে, ভাষ্যকারেরা যে-কালের উপযোগী ব্যাখ্যা করে গেছেন, সেকাল থেকে এ কালটা এত তফাত হয়ে পড়েছে যে, নিজের নিজের টিপ্পনী না কাটলে মানেটা কানেই থেকে যায়, ভিতরে পৌঁছয় না।

তাই আমাদের ভাব ঋষিকথায় শ্রোতার মনে পৌঁছে দিতে হলে, নিজের বোঝা মানেটা প্রকাশ করে বলতে হয়। দুএকটা নমুনা দিলেই যথেষ্ট হবে, তাতে যদি শ্রোতার ঋষিবচনের মধ্যে স্বাধীনভাবে বেড়াবার শখ হয়, সে তো খুব ভালো কথা।

খেলার ভাব

ঋগ্বেদে যে বিষ্ণুমন্ত্র আছে, যা আমাদের সব ক্রিয়ার আরম্ভে আওড়ানো হয়, অনেক সময় মানের দিকে দৃক্‌পাত না করে, তাতে

ভবের খেলার পদে পদে যে ভাব বদলে চলতে হয়, তার ইশারা পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এই :

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুঃ আততং।

কথার পিঠে কথা দিয়ে সাদা বাংলায় এর মানে দাঁড়ায় এই রকম :

সূরীরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ সদাই দেখেন,
চোখ দিয়ে আলোয় মেলা জিনিসের মতো।

চোখের সামনে আলোয় ধরে দেওয়া জিনিসের মতো— উপমা তো বেশ পরিষ্কার। কিন্তু সেই বিষ্ণুর পরমপদ কাকে বলে।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে বোঝা যায়, সেই বিষ্ণু হচ্ছেন যিনি ঈশা হয়ে লোকের মধ্যে যতলোক সব ছেয়ে আছেন। তিনি সৃষ্টির সব স্তরেই বিরাজ করেন, এক এক স্তরে বা লোকে তাঁর এক এক রকমের পদ দেখা যায়, আনন্দলোকে তাঁর চরম প্রকাশ। আনন্দ দেওয়া নেওয়াই তো প্রেম, সেই প্রেমের আবেগে নিচের লোক থেকে উপরের লোকে যেমন ওঠা যায়, তাঁর নিম্নপদ উচ্চপদ হয়ে দেখা দেয়, অবশেষে পূর্ণ-প্রেমে তাঁর পরম পদের দর্শন লাভ হয়।

ফুল কেজো লোকের হিসেবে ফলের সূচনা, শৌখিনের পক্ষে ঘর-বাগানের সাজ, ভাবুকের চিত্তে তার মহিমা অপার। মুনীব যাকে বলে চাকর, বিজ্ঞানীর সংজ্ঞায় সে নর, প্রেমিকের সে আপনার। ছেলেতে মা দেখেন স্নেহের পুতুল, জনসেবক দেখেন দেশের আশা, সূরী দেখেন বিশ্বরূপ। যশোদা-মার প্রেমের আলো যেবার স্নেহের টান ছাড়িয়ে উঠেছিল, তিনিও তাই দেখেছিলেন।

সূরীদের বলে জ্ঞানী; তার মানে প্রেমের আলোয় যা দেখা যায়, তাই সত্যি সত্যি জানা যায়। ধ্যানে জানতে হলেও সেই আলো চাই।

গায়ত্রী মন্ত্রে বলে সেই সবিতার বরেণ্য তেজ ধ্যান করতে। কোন্ সবিতা। যিনি আনন্দলোকের অধিপতি। তাঁর তেজ বা প্রকাশকে বরেণ্য বলে সেই স্থরী বোঝেন, যাঁকে প্রেম দিয়ে বরণ করা হয়েছে। নিচের আকিঞ্চন আর উপরের প্রেরণা, দ্বি-ধর্মী বৈদ্যুতের মতো পরস্পরের অপেক্ষা করে, পরস্পরকে টানে; শেষে প্রেমের ঝিলিকে উভয়ের মিলনানন্দের উচ্ছ্বাস। এ মিলন দৈব সুপ্রসন্ন হলে ঘটে, বলাও যা, আর ঘটনাটা রহস্যময় স্বীকার করাও তাই।

যাই হোক, আমরা এইটুকু বুঝেছি, ভবলীলার আরম্ভে, মাঝে, শেষে, সর্বত্র সেই প্রেম। হৃদয়ে প্রীতি নিয়ে আসা হয়, প্রীতি করতে থাকলে প্রেম বেড়ে চলে, প্রেম পূর্ণ হলে পাওয়া যায় নন্দলালকে।

খেলার উৎপত্তি

ঈশোপনিষদের এক শ্লোকে উৎপত্তির কথা আমরা যে ভাবে পেয়েছি তাই দেখাই—

স পর্যগাৎ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধং কবিঃ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাতাতথ্যতঃ অর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

এর মানে আমাদের কাছে এই ভাবে আসে—

তিনি বেরিয়ে এলেন,— সেই নিরাকার নির্বিকার অবস্থা ছেড়ে— এবং যিনি আপনাতে আপনি ভরপুর (স্বয়ম্ভূ) ছিলেন তিনি লোক-সকলের অধ্যক্ষ (পরিভূ) হয়ে, কবি-মনীষী-ভাবে (শাশ্বতীর) চিরকালের ও (সমার) কালের পর কালের পক্ষে উপযোগী ব্যবস্থা করলেন।

সর্বব্যাপী রইলেন সর্বব্যাপী, তবে সৃষ্টির কারণে একাকার অবস্থা স্তরে স্তরে লোকে লোকে ভাগ হয়ে গেল, তাতে তিনিও বহুখণ্ডিত

হয়ে আলো থেকে অন্ধকারে, সূক্ষ্ম হতে স্থূলে, পরিযানে (adventure-এ) বেরলেন, ভ্রমণে নয়, রমণ করতে। বেরিয়ে পড়া তো সহজ ; পুনর্মিলনে ফেরার, নিজের মহিমায় পুনঃ প্রবেশের পথই বাধাবিঘ্নে বন্ধুর, পদে পদে সৃষ্টিছাড়া মৃত্যুলোকে পড়ার ভয়ে বিপদসংকুল। তাই উপযুক্ত ব্যবস্থা আবশ্যক। কবি-মনীষী-ভাবে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মর্ম বোঝা যায় না, বুদ্ধি (intellect) ও বৃত্তি (emotion) দুয়ের সমঞ্জস (harmonious) উৎকর্ষ (culture) না হলে। ইংরেজি কথাগুলো দিয়ে দেখানো গেল যে ঋষিবাক্য একেলেভাবে আলোচনা করার অসুবিধে কিছু নেই।

ভয় ভাবনা, আশা ভরসা

উপনিষদে মাঝে মাঝে যে প্রার্থনা আছে তার দু-একটা দেখলে, আমরা যে-ভাবে মানে করেছি তার সায় পাওয়া যাবে।

অসতো মা সদ্ গময়
তমসো মা জ্যোতিঃ গময়, মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়।
অসৎ থেকে সতে নিয়ে চল,
অন্ধকার হতে আলোয়, মৃত্যু হতে অমৃতে নিয়ে এস।

সৃষ্টির মধ্যে অসৎ বলে কী থাকতে পারে? যা কিছু আছে তাই তো সৎ। অসৎ বলতে হলে, সৃষ্টির নিরাকার নিরঞ্জন পূর্বাবস্থা, যার সম্বন্ধে কোনো বাক্যই যখন খাটে না, তখন সৎও বলা যায় না, তাকেই অসৎ বলতে হয়। ওঁ তৎসৎ বলে নিজেকে এইটুকু মনে করিয়ে দিতে হয়, আমরা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সদানন্দ জীবন চালাচ্ছি এটা সেই বাক্য-মন-অতীতেরই প্রকাশ। তবে কি না, 'এটা নয়' 'ওটা নয়' করা ছাড়া

যার বর্ণনাই চলে না, সে অসৎ-অবস্থা রমণীয় নয়, তাই খেলার সাধ মেটানোর জন্যে সৃষ্টির প্রার্থনা এইভাবে উঠলো—

আমাদিকে সেই neutral অবস্থা থেকে positive সত্তার মধ্যে নিয়ে চলো,— তাতে দেহ ধরে মোদনীয়কে নিয়ে খেলা করব, যে বিপদ আসতে পারে তার রোমা যত পাব, ভয়-তরার উল্লাস জানব, শেষে স্থাবর আনন্দের বদলে জঙ্গম প্রেমের শিহরণ লাভ হবে।

প্রার্থনাটা কিন্তু ভয়ে ভয়ে করা,— মোহবশে আলোর সঙ্গে যোগ ছুটে যেতে দিলে তো অনন্ধালোকে পড়ে আত্মহত্যা করা হবে,— তাই পিঠ পিঠ আবদার—

নিচের অন্ধকার থেকে পথ দেখিয়ে আবার আলোয়, মৃত্যুলোক হতে বাঁচিয়ে আবার অমৃতময়লোকে ফিরিয়ে এনো।

এ কথাটাই অন্য অন্য জায়গায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা আছে—

আবিঃ আবীঃ ম এধি।

তুমিই তো আলো, তোমার সেই আলো আমাদিকে দেখালেই ফিরে যাবার পথ ঠিক পাব।

রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

মৃত্যুলোকের রুদ্রমূর্তি খেলাচ্ছলে চকিতে দেখে নেওয়ার পর, আর সারা রাস্তা তোমার সেই উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিয়ে পথে রেখো।

সত্যাগ্রহ সংকল্প

শ্রুতিবাক্য শোনানো হলে সকলে মিলে শান্তিপাঠ করা প্রথা। কিন্তু আমরা যে ভাবে বুঝেছি বুঝিয়েছি তাতে সে প্রথা মানা চলে না। এইসবের আগেকার নিষ্ক্রিয় অবস্থা শান্তিময়ই ছিল। তাতে মন উঠল না বলেই তো খেলতে বেরনো। খেলার শেষে হয়তো আবার শান্তি

আসবে, যদি ভূমানন্দের সে নাম দেওয়া অন্যায় না হয়। কিন্তু মাঝ-পথে শান্তি চাওয়া মানে তো বিপদ ডেকে আনা, ঝিমোতে ঝিমোতে আবছায়া লোকে ঘুরে মরা, হারেরই মতো stalemate-এ খেলা শেষ করা।

স্থিতপ্রজ্ঞ না হলে ভালো খেলোয়াড় হয় না, তা খুব মানি। যে স্থিতপ্রজ্ঞ সে ভবের ছবি, লীলার নিয়ম, মনে এমনি বসিয়ে নিয়েছে যে, তাকে পথ খোঁজার জন্যে আঁকুবাঁকু করতে হয় না। উপরের আলো-কে সে কখনো চোখের আড়াল হতে দেয় না, এগিয়ে না চললে পিছতে হবে তা সে কখনো ভোলে না। কিন্তু সে চঞ্চল নয় বলে মোটেই শান্ত নয়। সে জানে আবেগ শান্ত হলেই সব মাটি, কাজেই শান্তির প্রার্থনা করে না, সে চায় আবেগ, তীব্র আবেগ, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব জিতে উঠে যেতে পারে।

অতএব এসো, আমরাও আগ্রহ কামনা করি, আগ্রহের চর্চা করি, সত্যাগ্রহে খেলায় মাতি, তাহলে স্বয়ং লীলাময়, যাঁর নাম সত্য, তিনি নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন— জিত হবেই হবে।

সত্যমেব জয়তে।